হীরালাল ভকত কলেজ পত্রিকা

দিশারী

২০১৫—১৬ শিক্ষাবর্ষ

নলহাটি, বীরভূম

ন্যাক পিয়ার টিম-কে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন অধ্যাপকগণ।

ন্যাক উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পিয়ার টিম।

হীরালাল ভকত কলেজ পত্রিকা

দিশারী

পত্রিকা উপসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা

অধ্যাপক দেবব্রত সাহা, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক

প্রধান সম্পাদক

ড. চৈতন্য বিশ্বাস, বাংলা বিভাগ
এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রাতর্বিভাগ

সহযোগী সম্পাদক

ড. মণিশঙ্কর অধিকারী, বাংলা; অধ্যাপক গৌতম সেন,
ইংরাজি; অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জি, ইংরাজি,

সদস্যবৃন্দ

শ্রী ধনপতি মণ্ডল, প্রধান করণিক; শ্রী মলয় মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার করণিক

।। বন্দেমাতরম্ ।। বন্দেমাতরম্ ।।

শিক্ষার প্রগতি ঃ সংঘবদ্ধ জীবন ঃ দেশপ্রেম

শিক্ষার সর্বস্তরে দুর্নীতি এবং শিক্ষবিরোধী
পরিবেশ দূর করতে ছাত্রছাত্রীরা
সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হউন।

হীরালাল ভকত কলেজের বাৎসরিক পত্রিকা
দিশারীর সাফল্য কামনায়

তৃণমূল ছাত্র-পরিষদ
হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটি, বীরভূম

সভাপতি
নলহাটি শাখা

হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটি, বীরভূম

পরিচালন সমিতি

শ্রী বিপ্লব ওঝা	ঃ	সভাপতি, পরিচালন সমিতি
অধ্যাপক দেবব্রত সাহা	ঃ	ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং সম্পাদক, পরিচালন সমিতি
অধ্যাপক অমিয় কুমার দত্ত	ঃ	সরকারের প্রতিনিধি
অধ্যাপক অসীম কুমার পাল	ঃ	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, রামপুরহাট কলেজ
অধ্যাপক উত্তম মণ্ডল	ঃ	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়
শ্রীমতী করুণাময়ী ব্যানার্জি	ঃ	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, আসলেহা গার্লস কলেজ
ড. মণিশঙ্কর অধিকারী	ঃ	হীরালাল ভকত কলেজ, শিক্ষক প্রতিনিধি
অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জি	ঃ	হীরালাল ভকত কলেজ, শিক্ষক প্রতিনিধি
অধ্যাপক সৈয়দ এম. জামান	ঃ	হীরালাল ভকত কলেজ, শিক্ষক প্রতিনিধি
শ্রী সুভাষ ভৌমিক	ঃ	হীরালাল ভকত কলেজ, শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি
শ্রী অসীম কুমার ভড়	ঃ	হীরালাল ভকত কলেজ, শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি
সালাউদ্দিন সেখ্	ঃ	জি.এস., ছাত্র-সংসদ, ছাত্র প্রতিনিধি

বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক—শ্রী দেবব্রত সাহা

বাণিজ্য বিভাগ ঃ

ড. রঞ্জিত কুমার সরকার, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি এবং বিভাগীয় প্রধান।

অধ্যাপক বিমল পাল, সহযোগী অধ্যাপক, বাণিজ্য।

অধ্যাপক সলিল কুমার সেনগুপ্ত, সহযোগী অধ্যাপক।

একজন অঙ্কের শিক্ষক পদ শূন্য।

শ্রী সুখেন কুমার মণ্ডল, অংশকালীন অধ্যাপক।

শ্রী গৌতম কুমার মণ্ডল, অংশকালীন অধ্যাপক।

শ্রী সুরজিৎ সিন্‌হা, অতিথি অধ্যাপক।

বাংলা বিভাগ ঃ

ড. চৈতন্য বিশ্বাস, সহযোগী অধ্যাপক, এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রাতর্বিভাগ।

ড. মণিশঙ্কর অধিকারী, সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান

অধ্যাপিকা পিঙ্কি দাস, সহকারী অধ্যাপক।

ইংরেজি বিভাগ ঃ

অধ্যাপক গৌতম সেন, সহকারী অধ্যাপক।

অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান।

একজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক পদ শূন্য।

অধ্যাপক আব্দুর রেকিব, অতিথি অধ্যাপক।

ইতিহাস বিভাগ ঃ

অধ্যাপক সুকুমার মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক।

অধ্যাপিকা অমৃতা বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান

একজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক পদ শূন্য।

শ্রী উজ্জ্বল মণ্ডল, অংশকালীন অধ্যাপক, প্রাতর্বিভাগ।

শ্রী নেকশাদ খান, অতিথি অধ্যাপক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঃ

অধ্যাপক সৈয়দ মানোয়ারুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান।

একজন পূর্ণসময়ের শিক্ষক পদ শূন্য।

শ্রী নীলমণি মুখোপাধ্যায়, অংশকালীন অধ্যাপক।

তনুশ্রী সিন্‌হা, অংশকালীন অধ্যাপিকা (প্রাতর্বিভাগ)।

দর্শন বিভাগ ঃ
অধ্যাপক দেবব্রত সাহা, সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান।
একজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষকপদ শূন্য।
শ্রী রণজয় খান, অংশকালীন অধ্যাপিকা।
তনুশ্রী দাস, অংশকালীন অধ্যাপিকা।
শ্রীমতী মৌমিতা ব্যানার্জি, অতিথি অধ্যাপিকা (প্রাতর্বিভাগ)।
শ্রী নাজমুল হাসান, অতিথি অধ্যাপক।

সংস্কৃত বিভাগ ঃ
সুনন্দা বিষ্ণু, অতিথি অধ্যাপিকা।
শ্রী প্রীতম রুজ, অতিথি অধ্যাপক।
শ্রী অতনু ভট্টাচার্য, অতিথি অধ্যাপক।
শ্রী দেবাশীষ ব্যানার্জী, অতিথি অধ্যাপক।

ভূগোল বিভাগ ঃ
অধ্যাপক ইন্দ্রনীল মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রধান।
শ্রী নীলাদ্রি দাস, অতিথি অধ্যাপক।
শ্রী সুরজিৎ দাস, অতিথি অধ্যাপক।

পরিবেশ বিদ্যা বিভাগ ঃ
অধ্যাপক কৃতীমান বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রধান।
শ্রীমতী তাপসী মুখোপাধ্যায়, অংশকালীন অধ্যাপিকা।

শরীরবিদ্যা বিভাগ ঃ
শ্রীমতী সুমনা ঘোষ, অতিথি অধ্যাপিকা।
শ্রী বর্ষণ ঘোষ, অতিথি অধ্যাপক।

উর্দু বিভাগ ঃ
ড. বাবুল আলম, অতিথি অধ্যাপক।

অর্থনীতি বিভাগ ঃ
একজন পূর্ণসময়ের শিক্ষক পদ শূন্য।

গ্রন্থাগারিক ঃ
শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষা সহায়ক কর্মীবৃন্দ

শ্রী ধনপতি মণ্ডল, প্রধান করণিক।
শ্রী সুভাষ ভৌমিক, হিসাবরক্ষক।
শ্রী অসীম কুমার ভড়, ক্যাসিয়ার।
শ্রী মলয় মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার করণিক।
শ্রী ইন্দ্রজিৎ কুমার সাও, টাইপিষ্ট ক্লার্ক।
শ্রী শিশির দাস, করণিক।
শ্রী হুমায়ুন কবীর, ইলেকট্রিসিয়ান।
শ্রী পিন্টু মল্লিক, করণিক।
শ্রী বিপ্লব মারাণ্ডি, করণিক।
শ্রী আব্দুল বাসির, অফিস বেয়ারার।
শ্রী পরেশ কুমার পাল, দরোয়ান।
শ্রী কৃষ্ণগোপাল লাহা, অফিস বেয়ারার।
শ্রীমতী কৃষ্ণা নাথ, লেডি অ্যাটেন্ড্যান্ট।
শ্রী গণেশ প্রসাদ সাহানী, জেনারেটার অপারেটার।
শ্রী চন্দ্রশেখর লেট, লাইব্রেরী অ্যাটেন্ড্যান্ট।
শ্রী গোবিন্দ ফুলমালী, ল্যাব আটেন্ড্যান্ট
শ্রী নিখিল কুমার ফুলমালী, অংশকালীন সুইপার।
শ্রী তকবীর সেখ, অংশকালীন সুইপার।
শ্রী রমেশ মাল, অংশকালীন গার্ড।

হীরালাল ভকত কলেজ ছাত্র-সংসদ—২০১৫-১৬

অধ্যাপক দেবব্রত সাহা, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং সভাপতি।
শ্রী রিপন সেখ, সহ সভাপতি।
শ্রী সালাউদ্দিন সেখ, সাধারণ সম্পাদক (জি.এস.)
শ্রী চন্দন দাস, সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এ.জি.এস.)
শ্রী মেহেবুব সেখ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শ্রী সুব্রত দত্ত, ক্রীড়া সম্পাদক (আউটডোর)
শ্রী মাহাদুল হোসেন ও রেয়াজুদ্দিন সেখ, ক্রীড়া সম্পাদক।
শ্রী এমদাদুল হক, ক্রীড়া সম্পাদক (ইন্ডোর)।
শ্রী জাহাঙ্গীর হোসেন, পত্রিকা সম্পাদক।
শ্রী অরিজিৎ লেট, দেওয়াল পত্রিকা সম্পাদক।
শ্রী তোতন হোসেন, বয়েজ কমন রুম সম্পাদক।
আসেকা মেহেরুন (পলি), গার্লস্ কমনরুম সম্পাদিকা।
শ্রী হায়াফ হোসেন, বুকব্যাঙ্ক সম্পাদক।
শ্রী আকাশ ভকত, এন.সি.সি. সম্পাদক।
শ্রী ডাঙ্কেল মণ্ডল, এন.এস.এস. সম্পাদক।
মহ. কামাল হোসেন, ক্যান্টিন সম্পাদক।
শ্রী রোউনক মাহেশ্বরী, গ্রন্থাগার সম্পাদক।
শ্রী মাখন চিল্লাঙ্গীয়া, গ্রাউণ্ড সম্পাদক।

১৫ই আগষ্ট জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানাচ্ছে কলেজের এন.সি.সি ও এন.এস.এস. এর সদস্যবৃন্দ।

১৫ই আগষ্ট জাতীয় পতাকার নীচে কলেজের সভাপতি, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ।

ন্যাক উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীগণ।

সভাপতির প্রতিবেদন

হীরালাল ভকত কলেজের বাৎসরিক মুদ্রিত পত্রিকা 'দিশারী'র প্রকাশ আসন্ন জেনে আনন্দিত হ'লাম। যাঁদের উদ্যোগে প্রতিবছর নিয়মিত ভাবে পত্রিকাটি প্রকাশ হচ্ছে, সেই অধ্যাপক, অধ্যাপিকাবৃন্দ, শিক্ষাকর্মীবৃন্দকে জানাই শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ছাত্র-ছাত্রীদেরও জানাই স্নেহাশিস। তবে, বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেই হয় পত্রিকার সম্পাদক ড. চৈতন্য বিশ্বাস মহাশয়কে; কারণ, তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমেই নিজের মান বজায় রেখে ধারাবাহিকভাবে পত্রিকাটি প্রকাশের আলোয় আসে।

সব ছাত্র-ছাত্রীই পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য লেখা লিখতে পারবে, এমন নয়, নিজের চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি-উপলব্ধির কথা লিখে প্রকাশ করা শিক্ষারই একটা অঙ্গ। আমাদের কলেজে অন্তত লেখা প্রকাশের সুযোগটা আছে। এই কলেজের সভাপতি হবার পর থেকে আমি বুঝতে পারছি, এখানকার পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে ভালো। ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি, তাদের আচার-আচরণ, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণ, ফলাফল সবই সন্তোষজনক।

উদ্যমী শিক্ষকেরা নানান বিষয়ে উদ্যোগ নিচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ হবে, এমন উদ্যোগ কেউ নিলে তাঁকে সমর্থন করতেই হয়। তাঁদের পাশে দাঁড়াতেই হয়। হীরালাল ভকত কলেজ এবছর প্রতিবেশী কলেজগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা চালু করে। বহু ছাত্র-ছাত্রীই সে পরীক্ষায় অংশ নেয়। গত আগষ্ট মাসে একটা অনুষ্ঠান করে মাননীয় মন্ত্রী ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ শ্রীমতী শতাব্দী রায়, বিধায়ক জনাব মইনুদ্দীন শামস ও আরো অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের হাত দিয়ে ভালো ফলকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হয়। জেলায় এই উদ্যোগ প্রথম ও সাফল্যমণ্ডিতও।

আমাদের কলেজের কিছু দুর্বলতা আছে, কিছু ঘাটতি আছে, যা ইচ্ছা থাকলেও কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতিটা হ'ল জমি। একটা কলেজের যতটা জমি থাকা দরকার, তা' আমাদের নেই। কোনোভাবে সংগ্রহও করা যায় নি। জমির অভাবেই আমাদের খেলার মাঠ নেই। নিজস্ব মঞ্চ নেই; বিজ্ঞান বিভাগ খোলা যায় নি। তবে, মাননীয় মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমরা কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। আশা করবো, সরকারের সহায়তায় অনতিবিলম্বে আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে। একটি মঞ্চ তৈরির কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে।

এ বছর NAAC-এর ভিজিট ছিল, সেপ্টেম্বরের ৮-১০ তারিখে। সেই উপলক্ষ্যে কলেজকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। অনেক আসবাবপত্র কেনা হয়েছে, ভিতরে, বাইরে রং করা হয়েছে; ফিজিক্যাল এডুকেশনের উপযোগী মাঠ তৈরি করা হয়েছে। মাঠের চারপাশে গাছ লাগানো হয়েছে। তাতে কলেজের সৌন্দর্য যে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে কোনো সংশয় নেই। NAAC-এর Peer Team-এর কাছে ভালো ফল পাবার আগ্রহে শিক্ষকেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। পরিশ্রম করেছেন শিক্ষাকর্মী বন্ধুরাও। তাঁদের সকলের আন্তরিক চেষ্টাও শ্রমে জেলায় আমাদের কলেজই দ্বিতীয়বার NAAC ভিজিট করাতে সমর্থ হয়েছে। এটা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-শিক্ষার্থীদের সুসম্পর্কের প্রমাণ। এর জন্য আমি আনন্দিত এবং গর্বিত। আমি আশা করব, এই একতা এবং কলেজের প্রতি সকলের ভালোবাসা বজায়-থাকবে। উত্তরোত্তর কলেজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। পড়াশোনার মানও উন্নত হবে।

এই প্রসঙ্গে কয়েকজন অধ্যাপককে বিশেষভাবে প্রশংসা করা দরকার। তাঁরা হলেন বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক দেবব্রত সাহা, NAAC কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক গৌতম সেন এবং তাঁর সহায়ক তথা পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জি। এঁদেরই সুযোগ্য নেতৃত্বে হীরালাল ভকত কলেজ আজ জেলায় নানা দিক থেকে এক নম্বর আসন দাবি করতে চলেছে। আশা করবো, এঁদেরই সুযোগ্য পরিচালনায় কলেজের শ্রী এবং সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

কলেজকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী এবং ছাত্র-সংসদেরও কিছু ভূমিকা থাকে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যে সেই ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম। তা' গর্বের সঙ্গে বলতে পারি। ছাত্রদের দ্বারা অশান্তি ঘটেছে, এমন কোনো দৃষ্টান্ত গত বেশ কয়েক বছরে নেই। N.C.C., N.S.S.-এর ভূমিকাও এ কলেজে উল্লেখ করার মতো। ২৬শে জানুয়ারী, ১৫ই আগষ্ট, রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে এদের স্বত:স্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাকে মুগ্ধ করে। এ সব অনুষ্ঠানে যার উপস্থিতি এবং সক্রিয়তা অপরিহার্য, তিনি হ'লেন কলেজের প্রবীণতম অধ্যাপক ড. চৈতন্য বিশ্বাস। কলেজের যাবতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তিনিই মধ্যমণি। তাকেও ধন্যবাদ জানাই। তিনি যথেষ্ঠ অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। 'দিশারী' পত্রিকা তাঁর হাত ধ'রেই একটা বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকার মর্যাদা লাভ করেছে। আমি 'দিশারী'র সাফল্য কামনা করি।

তাং-মহালয়া ২০১৬
নলহাটি বীরভূম

সবশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আবেদন, তোমরা যে উদ্দেশ্যে কলেজে ভর্তি হও, যা পাবার জন্য অর্থ ও সময় ব্যয় করো, তা' সর্বাধিক পরিমাণে পাবার চেষ্টা করো। তোমাদের শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষকেরা প্রস্তুত। তোমার কর্তব্য, ক্লাসে তাঁদের সামনে বসা এবং তাঁদের দেওয়া শিক্ষা গ্রহণ করা। সেটা না করলে ভালো ফল আশা করা যায় না। আর ভালোফল না হ'লে সমৃদ্ধির অনেক দরজাই চোখের সামনে বন্ধ হয়ে যায়! তোমাদের ভালো ফল আমাদের গর্বিত করবে আশা রাখি। তোমাদের জন্য শুভেচ্ছা রইল। শুভেচ্ছা রইল পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ, সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীদের জন্যে। কলেজের সর্বাঙ্গীন শ্রী বৃদ্ধি কামনা করি।

বিপ্লব কুমার ওঝা
সভাপতি
পরিচালন সমিতি,
হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটি বীরভূম।

মেধাবী ছাত্রের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মাননীয়া সাংসদ শ্রীমতী শতাব্দী রায়।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের প্রতিবেদন

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও যথাসময়ে আমাদের বাৎসরিক কলেজ পত্রিকা 'দিশারী' প্রকাশ পেতে চলেছে শুনে আনন্দিত হ'লাম। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে এই দ্বিতীয়বার পত্রিকার জন্য প্রতিবেদন লিখতে হচ্ছে। প্রথমবার লেখার সময় মনে হয়েছিল, এটা একটা বিড়ম্বনা; কিন্তু এবার মনে হচ্ছে, প্রশাসক হিসেবে নিজের মনের কথা ছাত্র-ছাত্রীদের এবং কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যদের জানাবার জন্য সব থেকে ভালো মাধ্যম এই পত্রিকা। তাই, এবার উৎসাহের সঙ্গেই এ কাজে ব্রতী হয়েছি।

প্রথমেই কলেজের পরিচালন সমিতির মাননীয় সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দকে আমার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও স্নেহাশিস। বিশেষ ক'রে ধন্যবাদ জানাই পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীকে, যাঁদের আন্তরিক চেষ্টায় প্রতি বছর, ঠিক সময়ে পত্রিকাটি প্রকাশের আলোয় আসে। আমাদের কলেজ পত্রিকাটি প্রতিবেশী আর পাঁচটা কলেজ-পত্রিকার থেকে স্বতন্ত্র। একে একটা সাহিত্য-পত্রিকা বলা যেতেই পারে। প্রধান সম্পাদক ড. চৈতন্য বিশ্বাসের প্রেরণায় এবং তাড়নায় ছাত্র-ছাত্রীরা তো বটেই, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও কিছু না-কিছু লিখতে বাধ্য হন। সত্যি কথা বলতে কি, বাধ্য হই আমিও। সকলের লেখাই যে ছাপার যোগ্য হয়, এমন বলব না; তবে সেগুলোর মধ্যে থেকে নির্বাচন ক'রে ছাপার যোগ্য ক'রে নেন সম্পাদক।

মুদ্রিত পত্রিকার বিষয়গুলি কতটা পাঠযোগ্য হ'ল, সেটা বলবেন পাঠকেরা। আমি এই সুযোগে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ক'টি কথা ব'লে নিই। আমাদের কলেজের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকায় অনার্স এবং জেনারেল পাঠ্যক্রমে প্রচুর ছেলে-মেয়ে ভর্তি হয়; কিন্তু, তাদের অধিকাংশই ক্লাসে বসে না। কলেজে এসে অন্যান্য প্রয়োজন আগ্রহের সঙ্গে মেটাতে চাইলেও আগ্রহ নিয়ে ক্লাস করে খুব কম ছেলে-মেয়ে। এর ফলেই পাশের হার কমতে কমতে দশ শতাংশেরও নীচে নেমে গিয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা খুবই খারাপ লক্ষণ। সব কলেজেরই একই অবস্থা। তবু, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা ক'রে যাচ্ছি, কিসে উপস্থিতির হার বাড়ানো যায়, কিসে পরীক্ষার ফল ভালো করা যায়। আমাদের সেই চেষ্টা তখনই সার্থক হবে, যখন ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে—নিয়মিত ক্লাসে এসে বসবে, পড়াশোনায় আগ্রহ দেখাবে, শিক্ষকদের ক্লাস নিতে উৎসাহিত করবে।

এ বছরটা আমাদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বছর ছিল NAAC পরিদর্শনের জন্য। এই NAAC-এর প্রয়োজনে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে আমরা কলেজের ভিতরে-বাইরে অনেক পরিবর্তন সাধন করেছি। কলেজের বাড়ি-ঘরই শুধু রং করা হয়নি; অনেক স্থানেই ভেঙে নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন ক্যান্টিন ঘর তৈরি হয়েছে রাস্তার দিকে। পুরানো ক্যান্টিন ঘর শরীর বিদ্যা বিভাগের জন্য দেওয়া হয়েছে। সামনের মাঠে মাটি দিয়ে বিভিন্ন খেলাধূলা ও অনুষ্ঠানাদির উপযুক্ত করা হয়েছে। মাঠের চারিদিকে গাছ লাগিয়ে, জঙ্গল ও ঘাস কেটে পরিবেশকে সুন্দর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে এন.এস.এস. ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের উদ্যোগ ধন্যবাদার্হ। ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য সব থেকে বড়ো কাজ গ্রন্থাগারকে তিনতলা থেকে এক তলায় নামিয়ে এনে সাজানো। গ্রন্থাগারিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগ এবং লাইব্রেরীকর্মীদের পরিশ্রমে সুসজ্জিত এই গ্রন্থাগারে প্রবেশ করলে ভালো লাগে। তবে সকলের পরিশ্রম সার্থক হবে তখনই, যখন ছেলে-মেয়েরা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা বই নিয়ে পড়বেন।

এখন অন লাইন অ্যাড্‌মিশান, অনলাইন পেমেন্টসহ অনেক কিছু কম্‌পিউটার সহযোগে হচ্ছে। সি.সি.টি.ভি. চালু হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এখন বিনা পয়সায় নেট সার্চিং-এর সুবিধা পাচ্ছে, স্মার্ট-ক্লাসেরও ব্যবস্থা হয়েছে।

এ বছর থেকে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে 'Almanac বা Academic Diary তুলে দিয়েছি, যাতে কলেজের সারা বছরের কাজকর্মের এবং দরকারি তথ্যের সম্যক ধারণা দেবার চেষ্টা হয়েছে। আশাকরি এবং নতুন ছাত্র-ছাত্রীরা এর দ্বারা অবশ্যই উপকৃত হবে।

আমি আমাদের কলেজের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশংসা না করেই বলব, তারা যথেষ্ট ভালো। সব ব্যাপারে তাদের উৎসাহ এবং সহযোগিতা আমরা পাই। N.C.C. N.S.S সবসময় তাদের অনুষ্ঠানগুলি নিষ্ঠার সঙ্গেই করে। তাদের চেষ্টা আছে যাতে আমরা সবকাজে সফল হ'তে পারি। এ বছর আমরা 'মেধা অন্বেষণ' পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলাম। গত ১৩/৮/১৬ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী ড. অমিত বন্দোপাধ্যায়, মাননীয়া সাংসদ শ্রীমতী শতাব্দী রায়, মাননীয় বিধায়ক [illegible] সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে আমরা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করতে পেরেছি। মাননীয় মন্ত্রী ও সাংসদের কাছ থেকে কলেজের উন্নয়নে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পেয়েছি।

সবশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধ করব, তোমরা নিজেরা পড়াশোনা [illegible] ভালো হও, কলেজকে ভালো রাখো, কলেজের শান্তি-শৃঙ্খলা, পঠন-পাঠনের পরিবেশ বজায় রাখো। আমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ কামনা করি। [illegible] ও সমস্ত কর্মী অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী এবং কলেজের সঙ্গে যুক্ত সকলকে। সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি 'দিশারী' পত্রিকার।

১লা অক্টোবর, ২০১৬

শুভেচ্ছা সহ
[illegible] অধ্যক্ষ,
হীরালাল ভকত কলেজ

মেধাবী ছাত্রের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী ড. অমিত বন্দোপাধ্যায়।

দিশারী

মেধা অন্বেষণ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সাংসদ শতাব্দী রায়।

দিশারী

মেধা অন্বেষণ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিশারী

মেধা অন্বেষণ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

দিশারী

ন্যাক উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শকুন্তলা নাটকের একটা দৃশ্য।

ন্যাক পিয়ার টিম-এর বিদায়ী সভায় রিপোর্ট হস্তান্তর। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের হাতে রিপোর্ট তুলে দিচ্ছেন চেয়ারম্যান চাণ্ডে।

স্বাধীনতা দিবসে এন.সি.সি.-র শোভাযাত্রা।

আলোচনা সভায় উপস্থিত শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

দর্শন বিভাগের আলোচনা সভায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন

... বছরের ... একাধিক নির্দিষ্ট সময়ে ... অনুষ্ঠিত ... দিশারী প্রকাশ করে থাকে। ... পত্রিকা। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ... এর মধ্যেই এর রূপের মুক্তি হয়। ছাত্র ছাত্রীদের ... এই পত্রিকা। ... মনের কথা, চিন্তা ভাবনার ... কথা যতক্ষণ না একজন নিজে ভাবনাকে ... ততক্ষণ তাকে যথার্থ শিক্ষিত বলা যায় ... মধ্যে ... ভাবুক মানুষ এবং চিন্তাশীল ... মুক্ত করি। মুক্ত মন সবারই আমাদের। এই মুক্তির ... দিকেই ... মনের অন্ধ, ভাবের ... কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়। ... মনের ভাবনাকে মুক্ত করতে পারায় ... লেখা পড়ার মাধ্যমে অন্যের ... উক্তি ... পারার মধ্যেও আনন্দ। তাই, ... মুক্তি এবং ... পাঠ আমাদের প্রত্যাশাতেই হয়। এই আনন্দ মানুষকে বিশুদ্ধ করে, উন্নত করে, অভিজ্ঞ করে, রুচিবান করে, মানুষকে সুশীল মানুষ করে তোলে।

ছাত্র ছাত্রীরা সুশীল মানুষ হয়ে উঠুক, চিন্তাশীল, অভিজ্ঞ এবং সহৃদয় মানুষ হয়ে উঠুক, এই কামনা আমরা করি। চিন্তাচর্চা বা চিন্তার অনুশীলন সব থেকে ভালো হয় লেখা লেখির মাধ্যমে। তাই, আমরা চাই, ছেলে মেয়েরা লিখুক, লিখতে শিখুক। পরীক্ষার জন্য উত্তর বা নোটস্ নয়, নিজের মনের ভাবনাগুলোকে নিয়ে লিখুক। লেখার চর্চা করুক। বছরে একটা-দু'টো কবিতা লিখলেই লেখা হয় না। সময় বের করে নিয়মিত লিখতে হবে। লিখতে লিখতেই লেখা সরবে। ছাত্র ছাত্রীরাও কবি-সাহিত্যিক হয়ে উঠবে।

কে কতটা কবি-সাহিত্যিক হয়ে উঠল, বা কার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে—এটা যাচাই করবার প্রশস্ত মাধ্যম হ'ল স্কুল কলেজে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি। তাই, ছাত্র ছাত্রীকে মানুষ করার স্বার্থে, তাদের চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটাবার স্বার্থে পত্র পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচার করা আবশ্যক। হীরালাল ভকত কলেজে এই কাজটি আমরা করে থাকি। প্রতি বছরই নবীন বরণ ... হলে আমরা লেখা দেয়ার বিজ্ঞাপন দিই। ছাত্র ছাত্রীদের ... সময় দিই। সম্পাদনার ... সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত ক'রে লেখাগুলো নির্বাচিত প্রেসকে পাঠিয়ে দিতে হয়। পূজোর ছুটির পর, নভেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশ করা হয়। সেদিন অবশ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়, যাতে শিক্ষার আর একটি দিকের সঙ্গেও ছাত্র ছাত্রীদের পরিচয় ঘটে। গান বাজনা আবৃত্তি অভিনয় নৃত্য হাস্যকৌতুক সবই থাকে।

শুধু মুদ্রিত পত্রিকাটি আমরা প্রকাশ করি না, দেওয়াল পত্রিকার প্রকাশও করি। এ বছর সাহেবের তাগিদে বাংলা ইংরেজির পাশাপাশি ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিভাগও দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করেছে। উদ্যোগটা অবশ্যই ভালো। ছেলে-মেয়েরা যদি কবিতা-গল্প-ছড়া ইত্যাদি লেখায় অভ্যস্ত হয়, সেটা তো মঙ্গলের হবেই। তবে হতাশার কথা এই যে, কবিতা-ছড়া-গল্প-প্রবন্ধ—এসব লেখার দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ এখন তলানিতে। কলেজের তালিকায় হাজার তিনেকের উপর ছাত্র-ছাত্রীর নাম থাকলেও একশোটা লেখাও জমা পড়ে না। যারা লেখে, তারাও লেখার পদ্ধতি জানে না। শেখে না, শেখার চেষ্টাও করে না। তাই, সে সব লেখার অধিকাংশই ছাপার যোগ্য হয় না। পত্রিকার নির্দিষ্ট সংখ্যক পাতা ভরানোর তাগিদে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখার উপর কলম চালিয়ে ছাপার যোগ্য ক'রে নিতে হয়। কখনো বা শিক্ষকদের কাছ থেকে নিয়েও পাতা ভরাতে হয়।

লিখতে না-পারাটা দোষের নয়। অনেক শিক্ষক শিক্ষিকাও পারেন না। এটা প্রতিভা এবং অনুশীলন সাপেক্ষ। দু'চার জনেরই তো সেই প্রতিভা থাকে। জীবনানন্দ তো এই জন্যই বলেছেন, সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। তাই দু'-একজন ছাত্র-ছাত্রীও যদি এই পত্রিকাগুলির মধ্যে দিয়ে নিজেদের কবি সত্তা বা লেখক

সত্তাকে চিনতে পারে, তা'হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। সাহিত্যচর্চা অনেকটা নেশার মতোই। যার সে নেশা ধরে, তাকে বলতে হয় না, কবিতা লেখ, গল্প লেখ। সে নিজেই সময় বের ক'রে নিয়ে লিখবে এবং পড়বেও। আগে অবসর কাটানোর উপায় ছিল সাহিত্য চর্চা। ট্রেনে-বাসেও মানুষ সময় কাটাতো কবিতা-উপন্যাস-গল্প ইত্যাদি পড়ে। এখন মোবাইল ফোনের মধ্যেই বিনোদনের বা সময় কাটানোর হাজারো উপায় ভ'রে দেওয়ায় আক্ষরিক অর্থেই জগৎটা হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। এতে পড়া, শোনা এবং দেখা—তিন ইন্দ্রিয়ের কাজ একসঙ্গে চলতে পারে। তাই, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিনোদনের দিকেই নতুন প্রজন্ম ঝুঁকে পড়েছে। কেউ কেউ এতে এতটাই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, ক্লাসের পড়াশোনায়, শিক্ষণীয় বিষয় চর্চায় ফাঁকি দিচ্ছে। আমাদের কলেজে বিনা পয়সায় নেট-চাটিং-এর সুযোগ ক'রে দেওয়ায় কত ছেলেমেয়ে সারাদিন মোবাইল ফোন হাতে বারন্দায় বসে থাকে—ক্লাসে যায় না। কলেজ বন্ধ হবার পরও গেটের বাইরে কলেজের সঙ্গে সম্পর্কহীন বহু ছেলে বিনা পয়সায় নেট চাটিং করবার জন্য রাত্রি সাতটা-আটটা পর্যন্ত বসে থাকে। এরা তবে পড়াশোনা করে কখন? হায়! এমন নেশা যদি পড়াশোনায় থাকতো, তাহলে এদের উন্নতি কে আটকাতে পারত!

বিনোদনের নতুন মাধ্যম হাতে এসে যাওয়ায় যে সাহিত্যচর্চা, সংস্কৃতিচর্চা বন্ধ হয়ে যাবে, এমন আশঙ্কা করিনে। নতুন নতুন খাবারের আমদানি হ'লেও বাঙালীর ডাল-ভাতের প্রয়োজন যেমন ফুরাবে না, তেমনি সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চাও ঘুচে যাবে না। হয়তো, কাগজে না লিখে এখন গল্প-কবিতা মোবাইলেই লেখা হবে এবং প্রচার করা হবে। আমরা পুরনো দিনের মানুষ। পুরানো পদ্ধতিতেই এখনো শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদেরও বড়ো হ'তে গেলে, পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে গেলে প্রচলিত পথকে বর্জন করলে চলবে না। অনেক ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকেরা সেটা মাথায় রেখেছেন। তারা ভালো ফলও পাচ্ছেন।

এই পত্রিকায় এবার যারা লেখা দিয়েছিল, তাদের সকলের লেখাই ছাপা হয় নি। যেগুলো একটু-আধটু সংশোধন ক'রে পাঠযোগ্য করা গিয়েছে, সেগুলোই ছাপা হয়েছে। প্রথমবর্ষের পাশ-অনার্স ছেলে-মেয়েরাই এবার বেশি লেখা জমা দিয়েছে এবং ওদের লেখাই বেশি প্রকাশ করা হয়েছে। যাদের লেখা ছাপা হ'ল না, তাদের হতাশ হবার কিছু নেই। লেখা চালিয়ে গেলে হাত দিয়ে একদিন ভালো লেখা বেরিয়ে আসতেই পারে। এই মহকুমায় এখন প্রায় ৩০টির উপর সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ হয়। তাতে কয়েক শো মানুষ লেখালেখি করেন। আগ্রহী ছেলে-মেয়েরা চাইলেই সেখানে লেখা পাঠাতে পারে।

আমাদের 'দিশারী'র এবারের সংখ্যাটা একটু গুরুত্বপূর্ণ হবে। বছরটা ছিল ন্যাক পরিদর্শনের বছর। সেই উপলক্ষ্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় ক'রে কলেজটাকে সাজানো হয়েছে। কলেজের এই সৌন্দর্য এবং পরিবেশ পত্রিকার মধ্যেও প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছি। ন্যাক-উপলক্ষ্যেই গত জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বরে বিভিন্ন বিভাগের উদ্যোগে বহু আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাতে অংশ নিয়েছে। অবশ্যই উপকৃত হয়েছে তারা। সেই সব শুভ মুহূর্তের স্মৃতি ধ'রে রাখার জন্য এই সংখ্যায় বহু রঙিন চিত্র ছাপা হ'ল, যা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। পত্রিকার কোথাও কোনো ত্রুটি থাকলে সে দায় আমার। ভালো লাগলে ধন্যবাদ প্রাপ্য লেখক-লেখিকাদের। আমি বিশেষ ক'রে ধন্যবাদ জানাব বাণিজ্য বিভাগের দুই প্রবীণ অধ্যাপক ড. রঞ্জিৎ কুমার সরকার ও বিমল পাল মহাশয়কে। কারণ, পত্রিকার মান বাড়াবার জন্য আমার অনুরোধ স্বীকার ক'রে তাঁরা যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রে দুটি মূল্যবান রচনা এ পত্রিকায় ছাপতে দিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাই পরিচালন সমিতির সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকসহ সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দকে। ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই শুভেচ্ছা। এই পত্রিকাসহ সকলের মঙ্গল কামনা করে কলম থামাচ্ছি।

চৈতন্য বিশ্বাস
সম্পাদক, দিশারী পত্রিকা
হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটি

০১.১০.২০১৬

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
● পরিচালন সমিতির সভাপতির প্রতিবেদন		৭
● ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের প্রতিবেদন		৯
● পত্রিকা সম্পাদকের প্রতিবেদন		১৩
কবিতা ঃ		
১। শ্রী চরণে শ্রীচৈতন্য	সৈয়দ এম. জামান	১৭
২। আমার প্রশ্ন	পল্লবী মণ্ডল	১৭
৩। বর্ষা	কাজল সা	১৮
৪। আদর্শ শিক্ষক	সুলতানা খাতুন	১৮
৫। স্বপ্ন	কণিকা পাল	১৮
৬। আজব গ্রাম	রিজিয়া সুলতানা	১৮
৭। বর্ষা এবং	বর্ণালী পালিত	১৯
৮। সূর্য	নিরুপমা ফুলমালী	১৯
৯। গরিব	আমিনা খাতুন	১৯
১০। বর্ষা	মফিজুল সেখ	১৯
১১। মা	তন্ময় মণ্ডল	২০
১২। আধুনিক ছেলে	রবিউল আলম	২০
১৩। আমরা বাঙালী	ইন্দ্রাণী দাস	২০
১৪। স্বপ্ন ঃ বাস্তব	মমতা মণ্ডল	২১
১৫। সূর্যাস্ত কালে	সনিয়া মাল	২১
১৬। মানুষের ধর্ম	অনিতা নরসুন্দর	২২
১৭। জল দূষণ	বারিউল শেখ	২২
১৮। আয়না	সুখেন লেট	২৩
১৯। আমার স্বপ্ন	অনুরূপ পাল	২৩
২০। ছুটি	অর্পিতা মণ্ডল	২৪
২১। হিন্দু-মুসলমান	মিতা খাতুন	২৪
২২। মন ও মুখ	মুনমুন চৌধুরী	২৪
২৩। সমাজ	সুরজ লেট	২৫
২৪। পাখির মতো	কাবুল সেখ	২৫
২৫। অপ্রকাশ	মৌমিতা ভট্টাচার্য	২৬
২৬। রাবণ রাজার গান	কিরণ সেখ	২৭
২৭। মানুষ	বনশ্রী মণ্ডল	২৭
২৮। Dot	Sourav Prasad	২৮
২৯। I live on her love	Abdur Rakib	২৮

গল্প ঃ

১। ভালোবাসায় জীবন বলিদান	বিশ্বজিৎ চৌধুরী	৩১
২। প্রাপ্তি	ড. রঞ্জিৎ কুমার সরকার	৩৩
৩। আনন্দ	অমিত পণ্ডিত	৪০

নাটক ঃ

১। আবহমান	মনীষা মুখার্জী	৪২

ভ্রমণ কথা ঃ

১। সুন্দরবনে পাঁচ দিনের ভ্রমণ	পার্থ মন্ডল	৪৪

প্রবন্ধ ঃ

১। ভিন্ন ভাবনা	স্নেহাশিস সরকার	৪৬
২। পরীক্ষার উত্তরপত্র এবং হিউমার	ড. চৈতন্য বিশ্বাস	৪৮
৩। সুন্দর বনের লৌকিক মেলা	অধ্যা. সুকুমার মণ্ডল	৫৩
৪। মেঘদূত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ	অধ্যা. বিমল পাল	৫৬
৫। অন্য মানব জীবন	অধ্যা. প্রীতম রুজ	৫৯
৬। পৃথিবী, আকাশ এবং প্রথম মানুষ সৃষ্টি	ড. বাবুল আলম	৬৪
৭। Global Worming and its Enviromental Impact	Prof. Kritman Biswas	৬৬
৮। User Education Programme in College Library	Partha Chattopadhyay	৭১
৯। Human Values in Environmental Ethics : A Study	Prof. Debabrata Saha	৭৩
১০। Trafficking of Women : A Process of Social Marginalization	Prof. Suddhasattwa Banerjee	৭৬

নররূপায়নে ফিজিক্যাল এডুকেশন বিভাগ।

শ্রীচরণে শ্রীচৈতন্য

সৈয়দ এম. জামান
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

তুমি কত ভালো ছিলে ব'লে
আমাদের সাজুগুজু শোক্,
অভিনয় ভালোবাসা-সব
কতদূর পৌঁছাবে জানি না
শুধু জানি যে ইনাম দেওয়া হয়ে গেছে।
আসবে না ফিরে কোন দিন।
তাঁকে ছুঁতে আমাদের স্মৃতিচারণা—
যন্ত্র.....না, মন্ত্র.....না—
অনাবিল, সাবলীল,
একটাই প্রার্থনা—
তোমার সে পৌঢ় অভিজ্ঞতা, বিদগ্ধতা
মিশে যাক আমাদের যৌবনে
মনে-প্রানে সচেতনে
ইতিহাস ফলবতী হোক
নিখিল সাহিত্যাঙ্গনে
উদ্ভাসিত হোক্, উচ্ছ্বসিত হোক, হোক কলরব
কালে-কালে, মহাকালে ঘুরে ফিরে—
স্মৃতির স্মরণী বেয়ে
প্রাণপ্রিয় তোমার প্রতিষ্ঠানে
সাময়িক বিরহ ভুলে, দলে দলে
মহামানবের পতাকা তলে
ধ্বনিত হোক্-মহামিলনের সুর ও ঐক্যতানে
মুখরিত হোক্, হোক্ অনন্ত দিশারী
আমাদের কলেজ প্রাঙ্গণে।।

আমার প্রশ্ন

পল্লবী মণ্ডল
দ্বিতীয়বর্ষ (বাংলা)

তোমার হাতটি আজ বাড়াও বাড়াও,
ওদের দিকেও একটু চাও সহৃদয়ে,
ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত আর ভয়ার্ত মানুষ
ফুটপাতে, আকাশের নীচে যারা পেতেছে সংসার,
অবসন্ন দেহ নিয়ে সারাদিন যারা কাজ করে,
তোমাদের সুখ খুঁজে দেয়
তাদের মুখেও একটু খাবারের দানা তুলে দাও;
সহৃদয়ে হাতটা বাড়াও।
তাতেই তাদের ঠোঁট স্নিগ্ধ মনে হবে,
এক কণা হাসিতে জড়িয়ে যাবে মুখ।
ফুটপাতবাসীদের কাপড় জোটে না
স্থায়ী কোনো বাসস্থান, সেও তারা পায়না কখনো।
লজ্জা লুকোবার জন্য টুকরো কাপড়, ছেঁড়া ত্যানা
চেয়ে চিন্তে শরীরে জড়ায়।
মানুষের এ দারিদ্র্য কেন সৃষ্টি হয়?
উসকো-খুসকো চেহারার মানুষেরা বাজারের
বিজ্ঞাপন দেখে কৌতুহলে,
ছেলেমেয়েদের গায়ে জামা নেই,
সাজানো মণ্ডপে তারা দলে দলে ঘোরে,
সৌন্দর্য্যকে অনিচ্ছায় কলঙ্কিত করে। কিন্তু কেন?
আর পাঁচটা সাধারণ শিশুর মতন
বেঁচে থাকতে পারে নাকো সেকোন কারণে!
কেন তারা ছোবে নাকো বই-খাতা-শেলেট-পেন্সিল?
কে দিয়েছে এটে বলো ওদের সুখের ঘরে খিল!

বর্ষা

কাজল সা
দ্বিতীয়বর্ষ, বাংলা

বর্ষা মানে জল ভরা মাঠ, চতুর্দিকে কাদা,
বর্ষা মানে আকাশ কালো, কখনো বা সাদা।
বর্ষা মানে ভেজা বাতাস, কথায় কথায় জল,
ক্ষেতের ফসল সাঁতার কাটে, খাল-বিল-টল-মল।
বৃষ্টি ভেজা ছেলে মেয়ের সর্দি-কাশি-জ্বর,
বর্ষা মানে অনেক লোকের কর্মে অবসর!
বর্ষা মানে ধুলো ধোওয়া, আবর্জনা সাফ্,
বর্ষা যদি বন্যা আনে, তবেই মনস্তাপ।

স্বপ্ন

কণিকা পাল
প্রথমবর্ষ

এই তো সেদিন রাতের কথা, ছোট্ট একটি ছেলে,
মজার মজার স্বপ্ন দেখতো রাত্রি গভীর হ'লে।
সেদিন এলেন বিদ্যাদেবী, পুষ্পক রথে চ'ড়ে,
চাইল ছেলে আশীর্বচন হাত দুটি জোড় ক'রে।
একটা কিছু দিলেন দেবী তক্ষুনি সেই রাতে,
সকাল বেলা দেখতে পেল, 'দিশারী' তার হাতে।

আদর্শ শিক্ষা

সুলতানা খাতুন
প্রথমবর্ষ

এই কলেজের ছাত্রী আমি, গর্ব ক'রে বলি,
তাইতো আমি সাধ্যমতো নিয়ম মেনে চলি।
শিক্ষক শিক্ষিকা সবাই কতই ভালোবাসে,
ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনেরা তাই কলেজে আসে।
পড়াশোনা ছাড়াও হেথায় খেলাধূলাও হয়,
সংস্কৃতির অনেক কিছুই জানবো তো নিশ্চয়।
এত কিছু পাচ্ছি হেথায়, তাই তো ভালোবেসে,
মানুষ হবার জন্য পড়ি এই কলেজে এসে।

আজব গ্রাম

রিজিয়া সুলতানা পারভিন
প্রথমবর্ষ

একসে আছে আজব গ্রাম, উল্টো কাজের ধারা,
সন্ধ্যে বেলায় সূর্য ওঠে, দিনের বেলায় তারা।
গাছগুলো সব কমলা রঙের, ফলগুলো সব নীল,
কুকুর বিড়াল ইস্কুলে যায়, পড়ায় বসে চিল,
পায়রাগুলো সাঁতার কাটে, ডাঙ্গায় হাঁটে মাছ,
হাঁসগুলো সব তবলা বাজায়, শেয়াল জোড়ে নাচ।
মজার গ্রামে হরেক মজা, হয় না যেন শেষ।
কেউ কখনো দেখেছো কি এমন আজব দেশ।

বর্ষা এবং

বর্ণালী পালিত
প্রথমবর্ষ

এসেছে বর্ষা, উঠিয়াছে ঝড়, ভেঙেছে গাছের ডাল।
এসেছে বন্যা ভেঙেছে যে ঘর, জগৎ টালমাটাল।
নভ নির্মল, বেড়ে যায় জল, নেই কোনো সুখ-শান্তি।
সৃষ্টি কর্তা জানে কি একথা? বাড়ায় কেবল ক্লান্তি।
যেদিকে তাকাই সেদিকে শূন্য, জন নেই, জনারণ্য,
কষ্ট ক'রেই বেঁচে আছে, তবু, পশুপক্ষী অগণ্য।
আরো আছে যারা, কষ্ট করেই, ছোট ছোট কুড়ে ঘরে,
সেকথা স্মরণে, আসে যদি কভু, দুখ জাগে অন্তরে।
যেটুকুই পারি, আমি সেটা করি, দাঁড়াই তাদের পাশে।
হাতে হাত ধ'রে উঠিয়া দাঁড়াই, বেঁচে থাকবার আশে।

গরিব

আমিনা খাতুন
প্রথমবর্ষ

গরিব হওয়া বড় জ্বালা এ সমাজে ভাইরে,
চলতে পথে অনেক ব্যথা সহ্য করতে হয়রে!
কথায় কথায় মন্দ কথা শোনা বড়ো দায়,
গরিব হওয়ার যন্ত্রণা আর জ্বালার তো শেষ নাই!
দুইবেলা সে পায় না খাবার, দুঃখে কাটে দিন,
বড়োলোকের টানতে ঘানি শরীর যে হয় ক্ষীণ।
গরিব ছেলের হয় না চাকরি, হয় না মেয়ের বিয়ে,
গরিব ঘরে জন্ম গো যার, বাঁচবে সে কী নিয়ে?

সূর্য

নিরুপমা ফুলমালী
প্রথমবর্ষ

ওগো ও সূর্য, হৃদয়-আলোর কবিতাটি তুমি পড়ো
এ অন্ধকারে অসহায়দের আলোয় তুলিয়া ধরো!
জীবনে নতুন ভোর এনে দাও, নতুন পৃথিবী গ'ড়ো,
আলোর কবিতা পড়ো তুমি, ওগো, আলোর কবিতা পড়ো।
জানি তুমি এই বিশ্বের পিতা, তোমারই সৃষ্টি সব,
সবার উপর তুমি আছো প্রভু। জগতের গৌরব।
হিংসার বিষ দূর ক'রে দাও, প্রেমের পৃথিবী গড়ো,
আলোর কবিতা পড়ো তুমি প্রভু, আলোয় কবিতা পড়ো।

বর্ষা

মফিজুল সেখ
দ্বিতীয়বর্ষ

বর্ষা তোমার শীতল হাওয়ায়
আমার মনটা হারিয়ে যায়,
তোমার চেয়ে সুন্দর এই
জগতে আর কিছুই যে নাই।
তোমার কাছে এই আশা মোর,
তুমিই থাকো আমায় ঘিরে,
থাকতো যদি শক্তি আমায়
দিতাম রেখে বন্দী ক'রে।
টাপুর-টুপুর আওয়াজ তোমার
আকার তিরের ফলার মতো,
তোমার ধারায় যায়, ধুয়ে যায়
ধরার আবর্জনা যত।

আমরা বাঙালী

ইন্দ্রাণী দাস
তৃতীয়বর্ষ

স্বাধীন আমরা আমাদের দেশ, নামটি ভারতবর্ষ,
রাজ্যে রাজ্যে অশান্তি আজ, মানুষ যে বিমর্ষ!
ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, নেতাজী, রবি, বিবেকের দেশ,
আমরা বাঙালী তাই আমাদের গর্বের নেই শেষ।
কিন্তু আজকে নিঃস্ব বাংলা, নিঃস্ব যে সংস্কৃতি,
আগামী পুরুষ ফিরে পাবে আর, আগেকার সেই গতি?
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজে ও কর্মে নেই কারো আর নিষ্ঠা,
আসুন না ভাই, আমরাই করি বাংলা জাগানোর চেষ্টা!
কী নেই এখানে? উদ্যোগ নিলে হবে জানি সব কাজ,
মতভেদ ভুলে আসুন সবাই ত্যাজি যত ভয় লাজ।
আজকে আমরা শপথ নেবই, শ্রেষ্ঠ করবো দেশকে,
বাঙালী আবার সার্থকতায় ফিরে পাবে পরিবেশকে।

মা

তন্ময় মণ্ডল
প্রথমবর্ষ

সবার চেয়ে আপন যেগো, সেই তো আমার মা,
তার সাথে তো অন্য কারো হয়না তুলনা।
মা আমাদের দুখের সাথী, সুখের সাথী হয়ে,
পালন করেন ভালোবেসে স্নেহ আদর দিয়ে।
মা আমাদের জগদ্ধাত্রী, ছড়ান স্নিগ্ধ আলো,
মায়ের আশিস মাথায় নিয়ে সবাই থাকি ভালো।
মা নামটি বড়ই মধুর, শুনে জুড়ায় প্রাণ,
দিনরাত্রি তাই তো গাহি মায়েরই জয়গান।

আধুনিক ছেলে

রবিউল আলম
প্রথমবর্ষ

আমাদের দেশে আছে সেই ছেলে কত,
সুযোগ পাইলে যারা ভালোছেলে হ'ত।
বেকার বসিয়া আছে, কোনো কাজ নাই,
মাথা গুঁজে ভাবে শুধু, কিসে কাজ পাই।
চায়ের দোকান কিম্বা কোনো এক রকে,
দিনরাত আড্ডা দেয়, মন্দ কথা মুখে।
ঘরে কাজ করে নাকো, জনস্রোতে ভাসে,
খাবার সময় হ'লে ঠিক চলে আসে।
ঘাড় ছোঁয়া চুলগুলো এলোমেলো করা,
শর্টকাট, ফিটফাট জিন্স প্যান্ট পরা।
নিজেকে বাঁচাতে তারা বড্ড সচেতন,
বিপদের গন্ধ পেলে করে পলায়ন।
আদেশ করেন যদি কারো গুরুজনে,
শুনেও শোনে না তারা, নেয় নাকো মনে।

স্বপ্ন ঃ বাস্তব

মমতা মণ্ডল
তৃতীয়বর্ষ, বাংলা

স্বপ্ন দেখি গভীর ঘুমে রাতে,
পৃথিবীটা বদলে গেছে আনন্দের ছোঁয়াতে।
যে ছেলেরা মা বাবাকে করত অসম্মান,
সেই ছেলেরাই বাড়ালো আজ ভারত মাতার মান।
কলিকালের যে ছেলেরা ভুলে গেছে দায়,
তাদের মাঝে সত্য পেল ঠাঁই।
জীবনপথে চলতে কত দেখি অনাচার—
পাপ সেজেছে মহান কর্মী, আচ্ছা চমৎকার!
যে যুগেতে দুধের শিশু পেটের দায়ে খাটে,
জন্ম থেকেই ডুবছে মানুষ নানান সংকটে;
যে যুগেতে বয়স হ'লে মানুষ হয়গো বোঝা,
বাঁচার জন্য হয় গো শুরু বৃদ্ধাশ্রম খোঁজা;
এমন যুগে প্রশ্ন কিছু মনের মধ্যে জাগে,
স্বপ্নে আমার মন খুশি হয়, চক্ষে আলো লাগে।
সেই খুশিতেই ঘুম ভেঙে যায়, রাত তখনো বাকি,
মা উঠে কয়, কী হ'ল রে স্বপ্ন দেখলি না কি?
চক্ষু মেলে সব বুঝলাম, হতাশ হলাম, তাই তো,
ঘুমের দেশে যা ছিল তা' জাগার দেশে নাই তো!

সূর্যাস্ত কালে

সনিয়া মাল
তৃতীয়বর্ষ, বাংলা

দিনের আলো শেষ হ'ল যে,
ঘরে ফেরার পালা,
হাটুরেরা হাট ছেড়েছে,
পড়ে আছে চালা।
ঐ দেখ না চাষী বৌয়ের
আঁচল খানা ভেজা,
সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরে যায়
করতে ঠাকুর পূজা!
লাঙল কাঁধে ফিরছে চাষী
ধুলো পায়ে, ঘরে;
নাওয়ের মাঝি গান ধরেছে,
বৈঠা তুলে ধ'রে।
গরুর পায়ে উড়ছে ধুলো,
এই গোধূলি বেলা,
লাল অবিরে ঢাকল আকাশ,
এই বুঝি রং খেলা!
উঠল ভেসে আজান ধ্বনি,
বাজল কাঁসর ঘণ্টা,
আলো-আঁধারের আলিঙ্গনে
জুড়িয়ে গেল মনটা।

মানুষের ধর্ম

অনিতা নরসুন্দর
তৃতীয়বর্ষ, সংস্কৃত

মানুষ এখন বড়ই চালাক.
জানে নাকো তারা হারতে,
কারো উপকার করে যদি তারা
সে শুধু নিজের স্বার্থে।
স্বার্থ যেদিন ফুরাবে তাদের
চিনবে না আর কাকেও,
দেবে নাকো সাড়া কোনোমতে আর
কোনো সুজনের ডাকেও।
অল্পেতে তার চলবে না আর,
চাই আরো চাই, বলবে,
লোভ ও নেশায় নিজেকে হারিয়ে
ভুল পথে তারা চলবে।

বুঝবে যেদিন লোভের কুফল,
বুঝেও সুফল পাবে না,
জীবন যে তার হবে ছারখার,
পাশে কেউ কথা কবে না।

জলদূষণ

রবিউল শেখ
দ্বিতীয়বর্ষ, ইতিহাস

জলের দূষণ ঘটিও না আর
জলকে রাখো স্বচ্ছ,
জলের মাঝে আর ফেলো না
আবর্জনার গুচ্ছ।
জল দূষণে রোগের প্রসার;
রাখবে এটা মনে,
'জলই জীবন'—এ সত্যটাও
ভুলব কী কারণে?
বাড়ীর পাশে যদি থাকে
ক্ষুদ্র জলাশয়,
সে আমাদের মায়ের মতই,
নেই কোনো সংশয়।
মায়ের শরীর নীরোগ থাকলে
শিশুও সুস্থ থাকে,
স্বচ্ছ রাখতে শান দিতে হয়,
সবার চেতনাকে।

আয়না

সুখেন লেট
দ্বিতীয়বর্ষ, ইতিহাস

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি
নিজেকে যতক্ষণ,
শরীরটা তো বদলেছে বেশ
বদলেছে কি মন?
আগে ছিল ঝাঁকড়া চুল, আর
আজ হয়েছে টাক,
কয়েক গাছা চুল যা আছে,
তাও ধরেছে পাক।
তাগড়াই গোঁফ নিয়েছে বিদায়
মধ্য দেশে ভুড়ি,
তবুও মানুষ ভেবেই চলে,
নেই তার কোনো জুড়ি।

অনেক দিনের পরে যখন
কারোর সাথে দেখা,
বুঝতে পারি আমার মতন
সবাই নয়কো একা।
বয়স বাড়লে অভিজ্ঞতাও
বাড়তে থাকে সঙ্গে
পৃথিবীকে দেখার চোখও
বদলিয়ে যায় রঙ্গে।
বয়স কিন্তু সত্যি একটা
সংখ্যা বই তো নয়,
মনটা যদি সজীব থাকে
সবই করা যায়।

আমার স্বপ্ন

অনুরূপ পাল
তৃতীয়বর্ষ, বাংলা

আমার অনেক স্বপ্ন আছে, ক্ষুদ্র মনের মাঝে।
ঘোর কাটিয়ে প্রকৃতিকে দেখব নতুন সাজে।
চারিদিকের সবুজ মাঠে বাতাস যাবে বয়ে,
ভ্রমরেরা যাবে উড়ে গুণগুনিয়ে গেয়ে।
ভোরের বেলায় পাখি সবার ঘুম ভাঙিয়ে দেবে,
মাতাল করা গানের সুরে কোথাও টেনে নেবে।
উঠবে সবাই শপথ নিয়ে সকালের আহ্বানে,
বিশ্বমায়ের আমরা ছেলে,—সবাই যেন চেনে।
আমরা করব দেশের কর্ম শপথ গ্রহণ আজ,
সবাই মনে রাখবে, যেমন শা'জাহানের তাজ!

আমার অনেক স্বপ্ন আছে, ক্ষুদ্র মনের মাঝে,
আমার সাথে সাথ দিলে ভাই এগিয়ে যাবো কাছে।
সবার সাথে সাথ মিলিয়েই, করবো মায়ের পূজা,
মাতৃ-শত্রু মানুষগুলো পাবেই পাবে সাজা।
বৃক্ষরোপন করব আমরা, সবুজ করব দেশটা,
জীর্ণ পোশাক পাল্টে মাতা পরবে নতুন বেশ-টা।
দুঃখী মানুষ থাকবে না কেউ, থাকবে নাকো পাপ,
সবাই মিলে খুলে দেবো আনন্দেরই ঝাঁপ।
আমার অনেক স্বপ্ন আছে, ক্ষুদ্র মনের মাঝে,
মায়ের করবো পূজা, মা আজ সাজবে নতুন সাজে।

ছুটি

অর্পিতা মণ্ডল
প্রথমবর্ষ, বাংলা

সবার প্রিয় ছুটি যে গো, ছুটি সবাই চাই;
ছুটির মতো মজা যে ভাই আর কিছুতে নাই।
ছোট্ট খোকা পড়া থেকে চায় যে শুধু ছুটি,
বাবাও চান ছুটির মধু, যাবেন না ডিউটি।
বাপের বাড়ি য়াবে ব'লে মা ধরেছে বায়না,
এমন কি কেউ আছেন, যাহার কোনো ছুটিই চায় না।
পুলিশ কাকু বলেন, তাঁরও চাইযে ক'দিন ছুটি,
গিন্নীসহ পূজোর মাঝে যাবেন সায়েন্স সিটি!
ছুটি পেলে উকিলবাবু যান না আদালত
চাকরিজীবীর খুঁশিই বাড়ে, ডাক্‌লে ধর্মঘট।

'সবার ছুটি হ'লেও কেন হয়না ছুটি মোর!—'
কাঁদছে পোষা পক্ষীটি তার খাঁচারই ভিতর।
যেদিন গো এই জীবন ছেড়ে পাবো চির ছুটি,
বেরিয়ে যাবে কোন্ অজানায়, মায়ার বাঁধন টুটি!
মৃত্যুর চেয়ে বড়ো ছুটি আর যে কিছুই নাই,
সবার প্রিয় ছুটি যে গো, ছুটি সবাই চাই।।

হিন্দু-মুসলমান

মিতা খাতুন
দ্বিতীয়বর্ষ, বাংলা

আমরা যাকে আল্লা বলি, তিনিই ভগবান,
আমরা শুধু ভিন্ন নামে গাই তাঁর জয়গান।
একটি বৃন্তে দুইটি কুসুম—মুসলমান ও হিন্দু,
একই মায়ের রক্তে পূর্ণ দেহের প্রতি বিন্দু।
একই মায়ের দুই সন্তান, যদিও বা নাম ভিন্ন,
কালান্তরেও হবে নাকো বন্ধন তার ছিন্ন!
মৃত্যুর পর, কেউ কবরে, কেউ বা ওঠে চিতায়,
ঝগড়া বিবাদ ঘুচিয়ে তাই থাকব মিলে হেতায়!

মন ও মুখ

মুনমুন চৌধুরী
প্রথম বর্ষ

একটি মন স্বপ্ন দেখে, একটি মন ভাঙে,
একটি মন বিমর্ষ হয়, আর একটি মন রাঙে!
একটি থাকে মিলে মিশে, একটি স্বার্থপর,
একটি থাকে নিয়ন্ত্রণে, আর একটি হয় পর!
একটি মুখে কথা বলে, আর একটি মুখ গোমড়া,
একটি হাসির ফোয়ারা তোলে, একটি হোমরা-চোমরা!

সমাজ

সুরজ শেঠ,
প্রথমবর্ষ বাংলা

এই কি সমাজ! বড়ই ক্লান্তি!
কোথাও নেই একটু শান্তি।
চারিদিকে ওড়ে বারুদের পোড়া গন্ধ।
মরণের পথ খোলা সব খানে,
সন্ত্রাস কোলে লুকোচ্ছে কে জানে?
বিকাশের পথ সবদিক থেকে বন্ধ।

গাছ কেটে করি দামী আসবাব,
সবুজ জননী ক'রে দিই সাফ,
এই কী সমাজ! মানুষের বাসভূমি?
কাকে মেরে কে যে বড়লোক হয়,
কার উল্লাসে কে যে পায় ভয়;
এই পরিবেশে কী করব তুমি আমি!

মেয়েদের নেই সুরক্ষা আজো,
তবু কত কথা, কত সাজো সাজো,
এ অন্ধকারে কোথায় মানবিকতা?
কেউ কারো পাশে দাঁড়ায় না এসে
ধরে নাকো হাত কেউ ভালোবেসে,
একা অসহায় কাঁদে যে নির্যাতিতা।

পাখির মতো

কাবুল সেখ
প্রথমবর্ষ

আম্মা বলেন পড়রে, সোনা,
আব্বা বলেন মন দে,
পাঠে আমার মন বসে না
কাঁঠাল চাপার গন্ধে।
আমার কেবল ইচ্ছে জাগে
নদীর কাছে থাকতে
বকুল ডালে লুকিয়ে থেকে
পাখির মতো ডাকতে।
সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে
কর্ণফুলী কূলটায়,
দুধভরা ঐ চাঁদের বাটি
ফেরেস্তারা উল্টায়।
তখন কেবল ভাবতে থাকি
কেমন ক'রে উড়ব,
কেমন ক'রে শহর ছেড়ে
সবুজ গাঁয়ে ঘুরবো।
তোমরা যখন শিখছো পড়া
মানুষ হওয়ার জন্য,
আমি না হয় পাখিই হলাম,—
পাখির মতো বন্য।

অপ্রকাশ

মৌমিতা ভট্টাচার্য
তৃতীয়বর্ষ

প্রকাশ করার যত কথাই আছে,
সকল কথা যায় না প্রকাশ করা।
সকল জেনেও অন্ধ হয়েই থাকে
আমাদের এ বিপুল পসারি ধরা।
মন্দ জেনেও ভালোবেসেই মরি,
যাহারে হেরি হৃদয়ে ঘৃণা বাজে;
তাদের নিয়েই মত্ত মাতোয়ারা,
তাদের নিয়েই থাকি সুখের মাঝে।
বর্জিতে চায় মন যারে বারবার?
হয়না সফল আঁকড়ি ধরে শিরা,
কোন আবেশে বিহ্বলে জরজর।
নিকটে ডাকি দূরে রাখি সব কিরা,
এ নিয়েই হেথা দুঃখেতে হৃদি জ্বলে,
সান্ত্বনারি বাক্য নাহি পায়,
নিমেষেতে মনে হয় কোন ছলে,
সকল ফেলে বনেই চ'লে যাই।
হয়না সফল মহা স্নেহের স্পর্শে,
কার নেশাতে আঁকড়ে থাকে মন
সহিতে নারি বর্জিতে না পারি,
বুঝি নাকো কোন্ সে আকর্ষণ,
নিমেষেতে যদি বা ছিন্ন হয়ে,
আমার কভু ছিন্ন করে দিত;
একাকী থাকি এই পৃথিবীর মাঝে,
সকলভাবই ছিন্ন হয়ে যেত।
সুখকে আমি পেতাম নাকো তাতে
দুঃখ কি তোর হতো জীবনসাথী,
বুঝিনা ভাই কোথায় দেব ধরা।
বুঝিনা কভু কে মোর পক্ষপাতী।
সংসারেতে সকল খেলার মাঝে,
স্বার্থ বলি, প্রশ্ন আছে বড়ো,
খেলায় যদি সমান সমান হয়,
তাকেই তবে গোল বলিয়া ধরো?
প্রকাশ করা সকল কথাই মিছে,
আসল কথা প্রকাশ নাহি হবে,
ইহার প্রকাশ করবে নাতো কেউ,
পৃথিবী যে পড়বে ধরা তবে,
তুমি আমি যেমন করে বাঁচি,
অন্য যাঁরা, বাঁচুক তেমন ক'রে।
পাগল হলে যাবই চলে রাঁচি।
মনে আমার সকল প্রশ্ন ঘোরে।।

মানুষ

বনশ্রী মণ্ডল
দ্বিতীয়বর্ষ, বাংলা

পৃথিবীতে জন্মনিলেই মানুষ হওয়া যায় না,
তার জন্য মনুষ্যত্ব সাধন করা চাই।
বাইরেটা যার মানুষ-মানুষ, সেও অমানুষ হয়রে,
অন্তরে যার সত্যনিষ্ঠা, কিচ্ছুতে লোভ নাই—
সবার ভালো আগে যে চায়, নিজের ভালো পরে,
সেই তো সবার হৃদয়ে ঠাঁই পায়,
খাঁটি মানুষ বলতে তাকে একটু দ্বিধাও নাই।

সম্পদ, পদ, টাকার জন্য নিত্য খুনোখুনি,
বাধ্য হয়েই চোখে দেখি, কান পাতলেই শুনি;
তার মাঝেও মানুষ বাঁচে, বাঁচতে হবে ব'লে,
কেউ বা বাঁচে মাতাল হয়ে, কেউ বা চোখের জলে!

অমানুষরা শক্তি পেলে রাবণ হ'তে চায়,
জগৎ নাকি তারাই চালায়, তাদের বুদ্ধি বলে,
কে দিয়েছে বুদ্ধি তাদের? চাইলে পাওয়া যায়?
আমার-আমার কে করে গো, গো-মূর্খ-না হ'লে?

রাবণ রাজার গান

কিরণ সেখ
প্রথমবর্ষ, ইতিহাস

শ্রাবণ সাঁঝে রাবণ রাজা দশটি গলা ছেড়ে,
তানপুরাটি বাগিয়ে ধ'রে গান জুড়েছেন তেড়ে!
মনেতে তাঁর ভাব জেগেছে, মানছে না তা' বাধা,
তাই তো তিনি তাল ধরেছেন—সা-রে-গা-মা-পা-ধা।
শঙ্কা জাগে তান শুনে তাঁর, লঙ্কা কাঁপে ভয়ে,
তাল কানা সব রাক্ষসেরা পালায় শ'য়ে শ'য়ে।
ধূম্রবর্ণ কুম্ভকর্ণ অঘোর ছিল ঘুমে,
চমকে উঠে উলটে পড়ে খাটের থেকে ভূমে।
ভীষণ গানে বিভীষণের লাগল কানে তালা,
ঘাব্ড়ে গিয়ে বাথ্রুমে যায় রাবণ রাজার শালা।
শূর্পনখা নাকি সুরে বললে, 'দাদা, থামো',
এমন তরো গানের গুঁতোয় বাড়বে কানের ব্যামো।
রাবণ রাজার মামা ছিলেন বজ্রদ্রংষ্টা নামে,
গানের গুঁতোয় হঠাৎ গেল ভীষণ রকম ঘেমে।
রেগেমেগে ছুটে এলেন দু'কান চেপে ধ'রে,
'মা-মা-গা-ধা' বললি কি তুই? বললি কেমন ক'রে?
তানপুরাটা কেড়ে নিয়ে চোখ পাকিয়ে মামা,
বলেন পিঠে ক'ঘা দিয়ে, এবার তো গান থামা!
মামার মারে চিরতরে ভাঙলো রাজার গলা,
জলসাতেও রাবণকে আর গাইতে মিছে বলা।।

DOT

Sourav Prasad
B.Com, Part-II (Hons.)

It Started from a dot
weather is to hot
handkerchief is getting wet
From my sweat
everything is getting dry
it feels like to be fry
It was early warning
the reason, global warming.

I LIVE ON HER LOVE

Abdur Rakib
Guest Lecturer
in English (Honorary)

I live on her Love
(So) I love her,
I love her varied charms
That destroy all vices prevailing on Earth.
As she possesses bottomless generosity,
She is feted by all.
I become jubilant for works
With the touch of her affection.
They have vainly attempted to finish her
By bleeding
once and again,
(They think) she is killed.
Alas! they are fools!
She will never pass away,
She is deathless,
She is ever-youthful.
She is the Heart of Immortality.
Her great weapon is Love
And She always builds
The Nest of Love for me,
She never sits forlornly,......
She preaches and teaches the Art
OF Humanism and Congregation.
She feels and feels for me.
I live on her Love.......
And will ever live on her Love.....

COLLEGE
NALHATI, BIRBHUM
EXIT MEETING, 10 th

ভালোবাসার জীবন বলিদান

বিশ্বজিৎ চৌধুরী
(দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স)

সূর্য অস্ত যাবার সময় গোধুলির লাল রং যখন সমস্ত রাস্তাটাকে রাঙিয়ে তোলে, সেই সময় মেঠো পথ ধ'রে, ক্লান্ত শরীরে প্রতিদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরত দুইজন— সঞ্জয় ও জুলি। ওরা তিন কিলোমিটার দূরে সাগরদীঘি সুরেন্দ্র নারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাস ইলেভেনে পড়তো। প্রতিদিন তারা একসঙ্গে সাইকেলে চড়ে স্কুলে যেত। তাদের বাড়ি ছিল এক প্রত্যন্ত জালবাঁধা নামক গ্রামে। সঞ্জয় ও জুলির বাড়ি পাশাপাশি ছিল। তারা দুজনে যেমন ভালো বন্ধু ছিল, তেমনি তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কও গ'ড়ে উঠেছিল। সঞ্জয় যদিও একটু ধনী পরিবারের সন্তান, তবুও তার বিন্দুমাত্র অহংকার ছিলনা। তাই, সে জুলির মতো এক দরিদ্র পরিবারের মেয়েকেও ভালোবাসতে পেরেছিল। কিন্তু সঞ্জয় জুলিকে ভালোবাসলেও জুলির মধ্যে ছিল অহংকার, লোভ, লালসা।

সঞ্জয় যে জুলিকে ভালোবাসতো, এটা অমান্য করা যেত না। সঞ্জয় জুলিকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতেও চেয়েছিল। সঞ্জয়ের বাবা চেয়েছিল যে তার সন্তান ভালোভাবে লেখাপড়া ক'রে নিজের পায়ে যেন দাঁড়াতে পারে। কিন্তু সঞ্জয় পড়াশোনা চলাকালীন তার এক আত্মীয়ের হাত ধ'রে এক কোম্পানীর কাজের সন্ধান পায়। সেই অবস্থায় সঞ্জয় দূর শহরে কাজের জন্য যেতে আগ্রহী হ'ল. এই সংবাদ পেয়ে জুলি অত্যন্ত খুশি হয়; কিন্তু তার মনে এতটুকুও কষ্ট বোধ হয় না যে, সঞ্জয় তো চলে যাচ্ছে, তাহলে তার ভালোবাসা কি এবার বন্ধ হয়ে যাবে! হাজার হ'লেও তো জুলি সঞ্জয়কে ভালোবেসেছে! তাই সঞ্জয়ের যাবার সময় তার চোখ থেকে একরাশ জলের ধারা গড়িয়ে পড়েছিল। সঞ্জয়েরও তাকে ছেড়ে আসতে খুব দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। জুলি তার প্রেমিক সঞ্জয়কে বলে, আমার কথা ভুলে যাবে নাতো; তখন সঞ্জয় বলে, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, আর কোনদিনই আমি তোমাকে ভুলতে পারবো না।

বছর দেড়েক পরের কথা। জুলির পিতা মৃন্ময় বাবু, যদিও তিনি আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব, তবুও সমাজে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল; তিনি সমাজের আর পাঁচটা মানুষের মতো সবাইকে ভালোবাসতেন। মৃন্ময় বাবুর মনে কোনো কুটিলতা ছিল না। তিনি ভাবতে লাগলেন, জুলির বিয়ের কথা। মেয়ের বয়স তো কম হল না। গ্রামের ব্যাপার, পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা বলে। তাছাড়া সমাজে তো নানা নোংরা কাজও রয়েছে; তাতে যদি তার মেয়ের কোনো বিপদ ঘটে যায়। সেইরকম চিন্তাভাবনা মাথায় রেখে মৃন্ময়বাবু জুলির জন্য পাত্রের খোঁজ করতে লেগেছিলেন। এরপর জুলির মাথায় একেবারে যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিল। জুলিতো সঞ্জয়কে খুব ভালোবাসতো; তাই তাকে ছাড়া অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে জীবন কাটাবে কীভাবে? এই সাত-পাঁচ কথা ভেবে জুলির মনের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিতে থাকে। ঘরের এক কোনে গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে। তার মনের এইরকম অবস্থা দেখে মৃন্ময় বাবুর মনে খটকা লাগে। জুলি তখন সঞ্জয়ের ব্যাপারে সমস্ত কথা খুলে বলে। কিন্তু মৃন্ময়বাবু বুঝিয়েছিলেন, দেখ মা, গ্রামের ছেলেরা বাইরে গিয়ে স্মার্ট ও অহংকারী হয়, তোদের মত গেঁও মেয়েদের কথা কি তারা মনে রাখবে।

মৃন্ময়বাবু বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু জুলির এই বিয়েতে মত ছিলনা। ক্লাস ইলেভেনের ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পরেই তার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের দিন মৃন্ময়বাবুর চোখের জল বাধা মানতে চাইছিল না। কারণ তিনি জেনে শুনেও তার মেয়েকে এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে বিদায় দিবেন। সামাজিক কারণে বিয়েটা দিতে হয়েছিল। তাই তার কোনো মুক্তির পথ ছিলনা। জুলি কান্নায় ভাসিয়ে দিয়েছিল তার শরীর। জুলির বাবা-মা চোখের জলের সঙ্গে বিদায়

দিয়েছিল মেয়েকে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও জুলির মন মানতে চাইছিল না।

শ্বশুর বাড়িতেও জুলির বারবার সঞ্জয়ের কথা মনে পড়ছিল। কিন্তু, জুলির পক্ষে এর থেকে মুক্তির উপায় ছিলনা।

জুলির কাছে তার স্বামী ছিল ভগবানের মতো। তার স্বামী তাকে খুব ভালোবাসতো যেমন সঞ্জয় ভালোবাসা দিত। দিনদিন জুলি তার স্বামীর কাছে যোগ্য স্ত্রী বলে পরিচিতি পেয়েছিল। কিন্তু তার শ্বশুর-শাশুড়ি ছিল অন্য প্রকৃতির মানুষ। জুলিকে তারা কোনোদিন ছেলের বউ হিসেবে মানিয়ে নিতে পারেননি। সেই জন্যে জুলির সঙ্গে তার শ্বশুর-শাশুড়ির সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না।

জুলির বিয়ের দু'বছর পূর্ণ হওয়ার পরই সঞ্জয় গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসেছিল। সে তার কর্মজীবন থেকে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে এসেছিল। চারিত্রিক দিকে থেকে তার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। বাড়ি এসেই সঞ্জয় ছুটে গিয়েছিল জুলির বাড়ির দিকে। সঞ্জয় ভেবেছিল সে কিছুদিনের জন্য বাড়ি এসে জুলিকে জীবনের সাথী হিসেবে গ্রহণ করবে। কিন্তু, নিজের চোখে সঞ্জয় যা দেখল, তা তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হ'ল। জুলির বিবাহ হয়েছে জেনে সে তার মনকে স্থির ক'রে রাখতে পারছিল না।

সঞ্জয় ও জুলি কিছুক্ষণের জন্য দেখা করতে এসে তারা দুজনেই একে অপরকে বোঝাপড়া করতে বসেছিল। জুলির মুখে সব কথা শুনে সঞ্জয়ের চোখে অবিরত অশ্রু ঝরতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে জুলির চোখেও। এ অবস্থায় সঞ্জয়ের মনে, বুকের ভেতরটায় বড্ড কষ্ট হয়।

সঞ্জয় তার প্রেমিকা জুলিকে বিয়ে করবার জন্য তার বাবা-মাকে জানিয়েছিল। কিন্তু তার বাবা-মা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে যান। তারা সঞ্জয়কে বলেছিলেন তুই পাগল নাকি! জুলির বিয়ে হয়ে গেছে, আবার ওকে তুই বিয়ে করবি!

সঞ্জয়ের বাবা তাকে বলেছিলেন, এমন কোনো কাজ করবি না যাতে আমার মান সম্মানের হানি হয়। এইসব ঘটনা শোনার পর সঞ্জয় তার বাবা-মাকে বলেদিয়েছিল আমি যদি জুলিকে বিয়ে না করতে পাই, তাহলে আমার এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। সে আরও জানিয়ে দিয়েছিল, যে, সে জুলিকে যেমনটা ভালোবাসে, তেমনি জুলিও তাকেও খুব ভালোবাসে।

কিন্তু তার এইসব কথা সঞ্জয়ের বাবা-মায়ের কাছে গ্রাহ্য হয়নি। ধীরে ধীরে সঞ্জয়ের বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেতে বসেছিল। দিন যত যায়, সঞ্জয়ের মনের ভিতরটা তত গুমরে গুমরে মরে। সঞ্জয়ের মনে হয়েছিল তার ভিতরে যে আগুনটা জ্বলছে সেটা কেউ নেভাতে পারবেনা। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া।

শেষ পর্যন্ত জুলিকে মনের সঙ্গী হিসেবে না পেয়ে সঞ্জয়ের মনে ভাবনা জেগেছিল যে, সত্যিই এই শূন্য জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। তাই হঠাৎ একদিন দুপুর বেলার নিজের বাড়িতে নিজেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। নিজের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপড়শী এমনকি বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ছেড়ে শুধুমাত্র জুলির ভালোবাসার জন্যই নিজের প্রাণটা বলিদান দেয়।

প্রাপ্তি

ড. রঞ্জিত কুমার সরকার
সহযোগী অধ্যাপক (অর্থনীতি), বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিভাগ

।। ১।।

"একটু তাড়াতাড়ি চালা, আট্টু, নাহলে ডাক্তারবাবুকে দেখানো যাবে না" বলে রিক্সাওয়ালা আট্টুকে তাড়া দেয় বনমালী। "আচ্ছা, বাবু", বলে রিক্সার প্যাডেলে জোরে চাপ দেয় আট্টু। মিনিট পাঁচেক পর রিক্সা এসে দাঁড়ায় বাসস্ট্যান্ডের কাছে সুভাষ মেডিকেল কর্ণারের নিকট। রিক্সা থেকে নেমে বনমালী আট্টুকে ভাড়া মিটিয়ে বলে, তুই এখন চলে যা। কতক্ষণ ডাক্তারবাবুকে দেখাতে লাগবে তা তো জানি না। আমি বাড়ী ফেরার সময় অন্য রিক্সা ধরে নেব"। " ঠিক আছে, বাবু" বলে রিক্সা নিয়ে আট্টু বাসস্ট্যান্ডের অন্য রাস্তা ধরে। বনমালী সুহাস মেডিকেল কর্ণারের দোকানে গিয়ে কর্মরত ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করে "আচ্ছা ভাই, ডাক্তার সমর সেন কোথায় বসেন?" ছেলেটি তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে, "সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠে যান। ওখানে প্রথম ঘরটিতেই ডাক্তারবাবু বসেছেন। আপনি প্রথমে Attendant অনন্তের কাছে নাম লেখাবেন। ওই আপনাকে সব বলে দেবে। " সেইমত সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে বনমালী দেখেন একটি বন্ধ দরজার ঘরের সামনে বেঞ্চিতে কমপক্ষে কুড়িজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা বসে আছেন। একটি ছেলে চেয়ারে বসে একটি খাতা নিয়ে টেবিলে কি লিখছে। বনমালী ছেলেটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞসা করে, "ভাই ডাক্তার সমর সেন কি রুগী দেখছেন?" ছেলেটি আপাদমস্তক তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি এত দেরীতে এসেছেন। তবে আপনার ভাগ্য ভাল যে আজকের list এ আর একটি রুগীরই নাম লেখা যাবে। কারণ ডাক্তারবাবু ২৫টির বেশী রোগী দেখেন না। আপনার নাম কী?" "বনমালী খামরুই", উত্তর দেয় বনমালী। ছেলেটি তার list২৫ নংএ বনমালীর নাম লিখে তাঁকে বললো, "আপনার নাম ২৫ নং অর্থাৎ সব শেষে। এখন প্রায় ঘন্টা দুয়েক লাগবে। আপনি ঐ বেঞ্চিতে গিয়ে বসুন। আপনাকে ঠিক সময়ে ডেকে নেব।" "ঠিক আছে ভাই" ব'লে বনমালী ধীরে ধীরে গিয়ে বেশ কিছুটা দূরে একটি বেঞ্চির শেষপ্রান্তে বসে পড়ে এবং তারপর চারিদিক দেখতে থাকে। প্রথমেই বনমালীর চোখ পড়ে বন্ধ ঘরটির দরজার বাইরে লাগানো ঝকঝকে পিতলের name plate টির উপর। লেখা আছে, ডাক্তার সমর সেন, এম. বি. বি. এস. (ক্যাল), এম. ডি. (গোল্ড মেডালিস্ট), F.R.C.P. (USA), Cardiologist & Associate Professor, Deptt. of Cardiology, P.G. Hospital, Kolkata.

।। ২।।

বনমালী খামরুই শ্রীখন্ড জেলার সদর শহর ভবানীপুরের একমাত্র সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ভবানীপুর হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত অঙ্কের শিক্ষক। দীর্ঘ ৪০ (চল্লিশ) বছর তিনি এই বিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। বহু ছাত্র তাঁর হাত দিয়ে পরীক্ষায় পাশ করে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তাদের মধ্যে কেউ বা শিক্ষক, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা সরকারী আমলা, আবার কেউবা সরকারী অফিসে করণিক বা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। তাদের কারো নাম আজ মনে নেই। চেহারাও মনে নেই। তবে সেই চেহারার সঙ্গে আজ তাদের বর্তমান চেহারার কোনও মিল নেই। ফলে কারও সঙ্গে দেখা হলেও নিজে থেকে পরিচয় না দিলে তিনি বুঝতেই পারেন না যে এই ছেলেটি কিশোর বয়সে তাঁর ছাত্র ছিল। স্কুলে তিনি খুব ভাল অঙ্ক পড়াতেন বলে ছেলেরা তাঁকে আড়ালে "অঙ্কের জাহাজ" বলত, এ কথাটাও তিনি জানেন। এবং এজন্য তাঁর কিছুটা প্রচ্ছন্ন গর্বও ছিল মনে মনে। স্ত্রী মনোরমা এবং ছেলে তাতানকে (ভাল নাম অবিনাশ খামরুই) নিয়ে তাঁর সংসার। ছেলে রসায়ন নিয়ে এম. এসসি. পাশ করার পরে ডক্টরেট ডিগ্রী করার জন্য আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পরে সেখান

থেকে আর দেশে ফেরে নি। আমেরিকার নিউ জার্সিতে একটি সংস্থায় Chief Chemist হিসাবে সে কর্মরত। ওখানেই তার সহকর্মীকে বিয়ে করে সে স্থায়ী নাগরিক হিসাবে বাস করছে। একটি নাতনীও আছে তাঁর নাম অ্যানা। দু'তিন বছর পর পর সম্ভব হলে ছেলে এদেশে আসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। আবার কয়েকদিন পরেই কর্মস্থলে ফিরে যায়। আবার শুরু হয় তাঁদের দুইজনের সংসারজীবন। তবে হ্যাঁ, ছেলে বা বৌমা মাঝে মধ্যেই ফোনে তাঁদের খবরাখবর নেয় এবং তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে ওদের সঙ্গে ওখানে গিয়ে থাকার কথাও বলে। কিন্তু এই বৃদ্ধবয়সে আর বিদেশ-বিভুঁয়ে গিয়ে থাকার কথা তিনি ও তাঁর স্ত্রী মনোরমা ভাবতেই পারেন না। ফলে সুখে-দুঃখে এখানেই তাঁদের দিন কেটে যায়। এসব কথাই ভাবছিলেন বনমালী।

।। ৩।।

হঠাৎ বনমালীর চিন্তা ভেঙে যায় যখন তিনি দেখলেন বন্ধ দরজা খুলে সৌম্যকান্তি, সুদর্শন, মাঝবয়সী ডাক্তারবাবু Attendant অনন্তকে কিছু একটা বলল এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত অপেক্ষারত রোগীদের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। ডাক্তারবাবুর দৃষ্টি আটকে গেল বেঞ্চির একেবারে শেষ প্রান্তে বসে থাকা পক্বকেশ, দীর্ঘ চেহারার বৃদ্ধের উপর। বৃদ্ধকে তাঁর বেশ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথায় তাঁকে দেখেছেন সঙ্গে সঙ্গে মনে করতে পারলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃদ্ধকে তাঁর অত্যন্ত আপনজন বলে মনে হল। চেম্বারের মধ্যে ঢুকে তিনি বেল বাজিয়ে অনন্তকে ডেকে বললেন, "আচ্ছা অনন্ত, বেঞ্চির একেবারে শেষে যে বৃদ্ধ বসে আছেন, ওনার নাম কি এবং কত নম্বরে ওনার নাম আছে?" অনন্ত বললো "স্যার, উনি একেবারে শেষে এসেছেন, তাই ওনার নাম ২৫ নম্বরে আছে। তারপর তালিকা দেখে বলল, ওনার নাম বনমালী খামরুই।" নামটা শুনেই চমকে উঠলেন ডাক্তারবাবু। তাঁর মনের মধ্যে দীর্ঘদেহী সুপুরুষ চেহারার একজনকে মনে পড়ল যাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর কিশোর বয়সের, ছাত্রজীবনের কথা। তিনি অনন্তকে বললেন, "ওঁকে এখুনি ভিতরে পাঠিয়ে দাও।" অনন্ত চেম্বার থেকে বেরিয়ে সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললো, "ডাক্তারবাবু আপনাকে ভিতরে যেতে বললেন।" বনমালী বললো, "কিন্তু বাবা, আমার নাম একেবারে শেষে আছে। এতগুলো রোগীকে ফেলে আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে?" অনন্ত বললো, "স্যার আপনাকে ডেকেছেন, তাই আপনি যাচ্ছেন। এতে অন্য রোগীরা কিছু মনে করবে না।" বনমালী উঠে ধীরপায়ে চেম্বারের দরজা খুলে বললো, "ভিতরে আসব ডাক্তারবাবু।" "হ্যাঁ, আসুন, বসুন ঐ চেয়ারটায়", বললেন ডাক্তারবাবু। এবার বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখে ডাক্তারবাবু নিশ্চিত হলেন যে, তিনি যাঁর কথা ভাবছিলেন ইনিই সেই ব্যক্তি। কিন্তু মুখে কোনরকম কিছু প্রকাশ না করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নাম কী?" "বনমালী খামরুই," উত্তর দিলেন বৃদ্ধ। "বয়স কত"? উত্তর দিলেন, "পঁয়ছট্টি চলছে"। "কি করতেন আপনি?" "এই শহরের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘ চল্লিশ বছর অঙ্কের শিক্ষক ছিলাম। এখন অবসরপ্রাপ্ত।" এবার আর ডাক্তারবাবুর কোন সন্দেহ রইলো না যে তিনি যাঁর কথা ভাবছিলেন ইনিই সেই ব্যক্তি। তবুও মুখ-চোখে কোনরকম প্রকাশ না ঘটিয়ে তিনি বললেন, "আপনার অসুবিধাটা কি?" "মাঝেমধ্যে বাঁ দিকের বুকের নীচে একটু ব্যথা ব্যথা লাগে, তাই রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় না আর শরীরটাও সারাদিন ম্যাজম্যাজ করে। কোনরকম কাজ করতে উৎসাহ পাইনা। বুকের ডাক্তার হিসাবে আপনার কথা অনেকের কাছে শুনে তাই ভাবলাম আপনাকে একবার দেখিয়ে নিই।" "ঠিক আছে, ঐ পাশের বেঞ্চিটায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন।" বললেন ডাক্তারবাবু। এরপর কানে স্টোথো লাগিয়ে ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ ধরে বুকের বিভিন্ন দিকে স্টেথো বসিয়ে দেখলেন ডাক্তারবাবু। দেখতে দেখতে ডাক্তারের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগলো এবং বেশ চিন্তিত লাগলো। তিনি বললেন, "এবার উঠে চেয়ারটায় বসুন।" "কি দেখলেন ডাক্তারবাবু," জিজ্ঞাসা করলেন বনমালী। "আমার মনে হচ্ছে আপনার heart -এ কোন সমস্যা আছে, কিন্তু স্টেথোতে সেটা ভাল ধরা যাচ্ছে না। heart ব্লকও থাকতে পারে। কিন্তু ECG এবং Ecocardiography না করলে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না। আপনি ECG এবং Ecocardiography করে বিকেলের দিকে একবার আসতে পারবেন? আমি

সন্ধ্যে পর্যন্ত আজ এখানে থাকব। বেশী দেরী হলে কোনো সমস্যা হতে পারে।" "ঠিক আছে ডাক্তারবাবু, আমি পরীক্ষা দুটো করে বিকেলের দিকে আপনার কাছে আসব।" "ডাক্তারবাবু আপনার কত লাগবে? জিজ্ঞেস করে বনমালী। "আমি Prescription-এ লিখে দিয়েছি, আর দু'একটা ঔষধও লিখে দিয়েছি। নীচের ঔষুধের দোকানে গিয়ে দেখালে ওরাই দিয়ে দেবে।" "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এখন আসি তাহলে।" বলে বনমালী চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন। বেরুতেই তাঁর হাতের Prescription খানা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে Attendant অনন্ত বললো, "আমার সঙ্গে আসুন, দাদু"। নিচে নেমে অনন্ত ঔষধের দোকানের কর্মরত ছেলেটিকে বললো, "বিশু আরেকটা মুরগী নিয়ে এসেছি।" বলে Prescription খানা তার হাতে দিলো। বিশু Prescription খানা দেখে বনমালীকে বললো, "আপনার মাত্র দুটো ঔষধ আছে আর ECG এবং Ecocardiography করে রিপোর্টটা দেখাতে হবে।" তারপর দোকানের rack থেকে ঔষুধ দুটি নামিয়ে তাঁকে প্যাকেটে ভরে দিল। "কত লাগেব? বিশু এবার Prescription খানা ভাল করে দেখে বললো, "আপনার কোনো visit fees লাগবে না, শুধু ঔষুধের দাম বাবদ দুইশত ত্রিশ টাকা লাগবে।" "আমার visit fees লাগবে না কেন? "প্রশ্ন করলেন বনমালী। "আপনার Prescription এ ডাক্তারবাবু " Complimentary" লিখে দিয়েছেন। সাধারণত ডাক্তারবাবুর কোন অতি পরিচিত রোগী হলে তিনি এটা লিখে দেন এবং fees নেন না। আপনি কি ডাক্তারবাবুর পরিচিত? জিজ্ঞেস করলো বিশু। "না তো ভাই, আমি তো ডাক্তারবাবুকে চিনি না, আর ওনার পরিচিতও নই।" "এ ব্যাপরে আমারা কিছু করতে পারবো না, আপনি শুধু দুইশত ত্রিশ টাকা দিন।" বললো বিশু। ঔষুধের দোকানে টাকা মিটিয়ে একবার বনমালী ভাবলো ওপরে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করে কেন, তিনি visit fees নিলেন না। তারপর ভাবলো এখন নয়, বিকেলে রিপোর্টগুলো দেখাবার সময় কারণটা জিজ্ঞেস করবেন।

|| ৪ ||

ECG, Ecocardiography এগুলো নিকটবর্ত্তী "চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে" করিয়ে বনমালী দুপুর একটার সময় বাড়ী ফিরতেই মনোরমা উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "কি গো, এত দেরী হল? আমি তো খুব চিন্তায় ছিলাম। "বনমালীর কাছে সমস্ত ঘটনা শুনে মনোরমা চিন্তান্বিত হলেন। বললেন, "তবে একটা ব্যাপার অবাক লাগছে, ডাক্তারবাবু নিলেন না কেন? এখানকার দিনে এরকম ঘটনা তো শোনাই যায় না।" বিকালবেলা চিত্তরঞ্জন সেবাসদন থেকে রিপোর্টগুলো নিয়ে বনমালী দোতলায় উঠে দেখলেন যে তখনও প্রচুর রোগীর ভিড়। তিনি অনন্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, রিপোর্ট দেখাবার জন্য আবার নাম লেখাতে হবে কিনা। অনন্ত বললো, "তার দরকার নেই ভিতরের রুগিটি বেরুলে আপনি চলে যাবেন।" কিছুক্ষণ পরে রোগীটি বেরুলে বনমালী চেম্বারের ভিতর ঢুকে বললো, "আসবো ডাক্তারবাবু।" "আসুন মাস্টারমশাই, কই রিপোর্টগুলো দেখি। আপনি বসুন।" রিপোর্ট এবং ছবিগুলো দেখে ডাক্তারবাবুর মুখ-চোখ খুবই চিন্তাগ্রস্ত হতে লাগলো। ভ্রূ কুঞ্চিত করে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে বললেন, আপনার heart এর অবস্থা তো খুবই খারাপ বলে মনে হচ্ছে মাষ্টারমশাই। দুটো বা তিনটে block আছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু Angiography না করলে তো পরিস্কারভাবে বোঝা যাবে না। তাই অবিলম্বে Angiography করে দরকারে অপারেশন করতে হবে। কিন্তু এই শহরে তা সম্ভব নয়। আপনাকে কলকাতার গিয়ে করাতে হবে। আর যদি আপনি আমার পরামর্শ নেন, তবে বলব কলকাতায় সল্টলেকে "জগদীশ বোস Cardiology Centre এ অপারেশন করালে আমি করতে পারি, কারণ ওখানে আমি সপ্তাহে ২ দিন বসি।" তারপর ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বাড়ীতে আপনার কে কে আছেন? আপনি কি সব ব্যবস্থা করে আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার ওখানে যেতে পারবেন, তবে আমি সেইভাবে ওখানে বলে রাখব?" বলমালী বললেন, বাড়ীতে আমি এবং আমার স্ত্রী ছাড়া কেউ নেই। এক ছেলে আছে, কিন্তু সে থাকে আমেরিকায় নিউজার্সিতে। তাকে খবর দিলেও এত অল্প সময়ে সে এখানে আসতে পারবেনা। "ছেলে ওখানে কি করে?" ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন। "ওখানে chief

আমি তো অত টাকা নিয়ে আসিনি।" বললেন বনমালী। ভদ্রমহিলা বললেন, "ডাক্তারবাবু বলে রেখেছেন যে আপনার কাছ থেকে এখন যেন আমরা কোন টাকা না নিই, উনি পরে সব মিটিয়ে দেবেন বলেছেন। কাজেই আপনার কোন টাকা এখন লাগবে না।" শুনে বনমালী ও মনোরমা উভয়েই অবাক হলেন। বর্তমানে যেখানে ডাক্তারবাবুরা আগে সমস্ত টাকা মিটিয়ে না দিলে অপারেশন টেবিলে রোগীকে ওঠান না, সেখানে এই ডাক্তারবাবু তাঁর উপর এত উদার কেন? ভবানীপুরের চেম্বারেও তিনি কোন visit নেন নি। তারপর নিজেই এতসব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। "চলুন diagonistic centre এ। আপনার স্ত্রী এখানেই থাকুক।" বনমালীর চমক ভাঙে ভদ্রমহিলার কথায়।

।। ৭।।

Angiogram করার পর বিকেলের দিকে ডাঃ সেন সমস্ত ছবি দেখে খুবই চিন্তিত স্বরে বললেন, "দেখুন মাষ্টারমশাই আপনার হার্ট-এ দুটো ব্লক রয়েছে, যে কোন সময় আপনার heart stroke ঘটে যেতে পারে। কাজেই আমি পরশুর দিন অপারেশন করব। কালকের দিনটা আপনি এখানেই ভর্ত্তি থাকুন। আর পরশু আপনার অপারেশনটা করার পর আমি দিন সাতেকের জন্য England এ একটি Cardiology Conference এ যোগ দিতে যাবো। আপনি আশা করছি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন। অপারেশনের পরে আপনাকে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। সাবধানে থাকতে হবে। আমার সহকর্মী ডাক্তার এ ব্যাপারে আপনাকে সবকিছু অপারেশনের পর বলে দেবেন। আপনার স্ত্রীকে আমি এ ব্যাপারে সব বলে দিচ্ছি। আপনি কোনরকম চিন্তা করবেন না।" "কিন্তু ডাক্তারবাবু, ওরা তো আমার কাছে কোন রকম টাকাপয়সা নিল না, আপনি নাকি বলেছেন পরে নেবেন। আর তাছাড়া আমি তো অত টাকাও নিয়ে আসিনি।" বললেন বনমালী। ডাক্তারবাবু কথাটা তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, "দেখুন এখন টাকা পয়সা নিয়ে কথা বলার সময় নেই। আপনাকে অপারেশন করে সুস্থ করে তোলাটাই আমার প্রধান কাজ। অপারেশনের পরে দিনদুয়েক আপনাকে এখানেই ভর্ত্তি থাকতে হবে। Post-operative পর্য্যবেক্ষণের জন্য। তারপর আপনি বাড়ী ফিরে যেতে পারবেন। শ্রীখণ্ডের ভবানীপুরে আমার চেম্বারে গিয়ে দেখা করবেন। ওখানেই না হয় টাকা-পয়ার আলোচনা হবে।" বলেই ডাক্তারবাবু সহকর্মী ডাক্তার ও নার্সকে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

।। ৮।।

অপারেশন ঠিকভাবেই হলো। সৌভাগ্যবশতঃ কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। ডাঃ সেন অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরুতেই মনোরমা জিজ্ঞেস করলেন, "ডাক্তারবাবু, কেমন আছেন উনি?" ডাঃ সেন বললেন "Operation sucessful" । দিন দুয়েক পরে উনি এখান থেকে ছাড়া পেয়ে যাবেন। তবে খুব সাবধানে রাখবেন। তারপরে ভবানীপুরের চেম্বারে ওকে নিয়ে আসবেন। তখন একবার দেখে কিছু ঔষধপত্র ও পরামর্শ দিয়ে দেবো।" "আর টাকাপয়সা, ডাক্তারবাবু?" জিজ্ঞেস করলেন মনোরমা। "ও ব্যাপারে এখন ভাবতে হবে না, আমি মাষ্টারমশাইকে বলে দিয়েছি, ভবানীপুরে গিয়ে ও ব্যাপারে কথা বলব। এখন আসছি আমি।" বলে Rest Room এর দিকে চলে গেলেন ডাঃ সেন। মনোরমা মনে মনে বলল, "আপনি তো ডাক্তারবাবু আমাদের ছেলের কাজ করলেন। দীর্ঘজীবি হউন, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"

।। ৯।।

কলকাতা থেকে মোটামুটি সুস্থ হয়ে ভবানীপুরের বাড়ীতে ফিরে এলেন সস্ত্রীক বনমালী। এখন তাঁর শরীর অনেকটা ফুরফুরে, কোন অসুবিধা নেই, সবকিছু করতে এখন আগের মত উৎসাহ পাচ্ছেন। মনে মনে ডাঃ সেনকে তিনি কৃতজ্ঞতা জানালেন। তারপর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভবানীপুরের নির্দিষ্ট দিনে ডাঃ সেন এর চেম্বারে গিয়ে উপস্থিত হলেন কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানোর জন্য এবং সেইসঙ্গে পরবর্ত্তী উপদেশ নেবার জন্য। Attendant ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমরা দেখা করব। নাম লেখাতে হবে কি?" ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলো, "আপনার নাম কী?"

বনমালী নিজের নাম বলায় ছেলেটি বললো, "আপনার কথা স্যার আমায় বলে রেখেছেন। ভিতরের রুগীটি বেরুলেই আপনারা যাবেন।" রোগীটি বেরুতেই বনমালী স্ত্রীকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে বললেন, "নমস্কার ডাক্তারবাবু। আপনার কৃপায় আবার নূতন জীবন ফিরে পেলাম। তাই আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে এলাম আর টাকাপয়সা তো কিছুই নেননি আমার কাছে, তাই এই ব্যাপারে কথা বলতে এলাম।" "বসুন আপনারা", বলেই ডাঃ সেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বনমালী ও তাঁর স্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, "আপনি আমাকে চিনতে পারবেনি স্যার। আমি কিন্তু প্রথমদিন চেম্বারের বাইরে আপনাকে দেখেই চিনেছিলাম। তাই তখনই ঠিক করেছিলাম আপনাকে সুস্থ করে তোলার পরেই আমার পরিচয় দেব।" বনমালী তাঁর বিব্রত ও হতস্তত ভাব কাটিয়ে বললেন, "তুমি কে বাবা? আমি তো তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না। আর আগে দেখে থাকলেও এখন তো তোমার চেহারায় অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। কাজেই নিজে থেকে পরিচয় না দিলে আমি তো প্রায় কাউকেই চিনতে পারি না।" "আমি সমর, সমর সেন। আপনার ছেলে অবিনাশ বা তাতান আমার সঙ্গেই পড়ত। আমি তো স্যার খুব একটা ভাল ছাত্র ছিলাম না। ফার্স্ট বা সেকেন্ড কোনদিন হতে পারি নি। তবে প্রথম দশজনের মধ্যে থাকতাম। তাই আমাকে হয়ত বিশেষভাবে আপনার মনে নেই। তবে আপনাকে আমার বিশেষভাবে মনে আছে একটি বিশেষ কারণে এবং যার জন্যই আমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়েছিল এবং আপনাদের আশীর্বাদে আমি এতদূর উঠতে পেরেছি।" বলে থামলেন ডাক্তারবাবু।

"কি সেই বিশেষ কারণ?" জিজ্ঞেস করলেন মনোরমা। সমর বললেন, "স্যার তো ক্লাসে খুবই ভাল অঙ্ক করাতেন। স্যারকে তো আমরা "অঙ্কের জাহাজ" বলতাম। যত কঠিন অঙ্কই হোক না কেন, স্যারকে এক মিনিটের বেশী কোনদিন ভাবতে দেখি নি। আর স্যার একটা কথা বলতেন, "ওরে formula না জানলে অঙ্ক করা যায় না। সর্বদা formula মুখস্থ রাখবি।" মাঝেমাঝে পরীক্ষা করার জন্য হঠাৎ কাউকে কোন formula জিজ্ঞেস করতেন। না পারলে বকাবকি করতেন। এইরকম একদি হঠাৎ আমাকে একটা formula জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি তখন পাশের বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলাম। formula টাও আমি বলতে পারি নি। স্যার তখন ভীষণ রেগে গিয়ে আমার কান ধরে গালে একটা চড় মেরে বলেছিলেন "formula মনে নেই, আবার ক্লাসে গল্প করা হচ্ছে এরকম করলে জীবনে উন্নতি করবি কি করে?" আমি বাবা বা মায়ের কাছে কোনদিন কানমলা বা মার খাইনি তাই সকলের সামনে আমাকে চড় মারায় আমি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলাম। সেদিন বাড়ী ফিরে আমি কিছু খেতে পারি নি। বাবা-মাকে সত্যি ঘটনাটা বলতেও পারিনি। সারা রাত্রি আমি বিছানায় শুয়ে কেঁদেছিলাম আর সেই দিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জীবনে আমাকে বড় হতে হবে, প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, আর তারপর আপনার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর বাবার বদলীর চাকরি হওয়ায় আমিও এখান থেকে চলে গেছিলাম। আপনার ও আমাকে মনে নেই। কিন্তু তারপর এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে এটা কোনদিনই ভাবতে পারিনি। তবে ঈশ্বরের কৃপায় আপনাকে যে সুস্থ করে তুলতে পেরেছি, এটা আমার পরম প্রাপ্তি।"

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে একটু থামলেন সমর সেন। বনমালী ও মনোরমার চোখের কোণাগুলো তখন জলে ভরে ওঠে। চিক্‌চিক্ করছে। আর সেই সঙ্গে চোখে-মুখে একটা তৃপ্তি ও আনন্দের ভাব ফুটে উঠেছে।

এবার চোখের কোণা রুমাল দিয়ে মুছে বনমালী বললেন, "বাবা, আমার একটা চড় খেয়ে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করে আজ এতবড় একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার হয়ে পেরেছো, তার জন্য আমি ভগবানের কাছে আমার প্রণাম জানাই। আরোও বড় হও, আরও খ্যাতি হউক তোমার জীবনে শান্তি পাও তুমি—এই কামনাই করি। তবে একথা হয়ত আরও কিছু ছাত্রকেও আমি মেরেছিলাম। তারা অনেকেই ওটা মার হিসাবেই নিয়েছে, আঘাত হিসাবে নেয়নি। তা না হলে তোমার মত এরকম আরও প্রতিষ্ঠিত ছাত্র পেতাম আমি। কিন্তু একটা কথা বাবা, প্রথম visit থেকে অপারেশন পর্যন্ত কোন টাকা পয়

নাও নি। বলেছিলে পরে দেবেন। তাই ঐ ব্যাপারে কত কি লাগবে যদি একটু বলো।"

এবার ডাঃ সেন বললেন, "ছাত্রও তো পুত্রের মত স্যার। পিতার কাছে পুত্র কি টাকাপয়সা নিতে পারে? তাছাড়া, আমাদের শাস্ত্রে যে বিভিন্ন ঋণের কথা বলা আছে তার মধ্যে অন্যতম হল গুরুর ঋণ। মা বা বাবার ঋণ যেমন শোধ করা যায় না, তেমনি গুরুর ঋণও শোধ করা যায় না। গুরু, ছাত্রকে দিক বা মার্গ দর্শন করান আর ঠিকমত মার্গদর্শন হলে তবেই সেই ছাত্র পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত ও উন্নত হতে পারে। রামায়ণ ও মহাভারতে এরকম বহু গুরুর কথা আমরা পড়েছি। আমার কাছে আপনিও সেই রকম একজন গুরু। তাই আপনার কাছে কেন ঊষা মা অসুখের চিকিৎসার কোন খরচ আমি নিইনি আর কোনদিন নিতেও পারব না। তাই এ ব্যাপারে আপনি আর আমাকে কিছু বলবেন না, এটাই আমার মিনতি।" অশ্রুসজল চোখে বনমালী বললেন, ঠিক আছে বাবা, তাই হবে। তবে একটা জিনিস তো তোমাকে আমি দিতেই পারি।" "সেটা কী স্যার", বললেন ডাঃ সেন। "আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণঢালা আশীর্বাদ। আমি ছাত্রদের বলতাম শুধু পড়াশুনা করলেই হবে না, মানুষের মত মানুষ হও। আমার এটাই সান্ত্বনা যে অন্ততঃ একজন ছাত্রকে আমি দেখলাম যে শুধু জীবনে প্রতিষ্ঠিতই হয়নি, মানুষও হয়েছে। ঠিক আছে বাবা, এবার তাহলে আমরা আসি। বাইরে তোমার অনেক রোগী বসে রয়েছে। অনেকটা সময় নিয়ে নিলাম তোমার।"

"ঠিক আছে স্যার, এই কাগজে কিছু নিয়মকানুন লেখা আছে। এগুলো পালন করবেন আর ঔষধ কিছু লিখে দিচ্ছি এগুলো ব্যবহার করবেন স্যার সাবধানে থাকবেন। আর শারীরিক কোন সমস্যা হলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। আমার মোবাইল নাম্বার তো আপনাকে আগেই দিয়েছি।" বলে আবার পায়ে হাত দিয়ে স্যার ও তাঁর স্ত্রীকে অত্যন্ত ভক্তিভরে প্রণাম করেন ডাঃ সমর সেন এবং চেম্বারের দরজা খুলে এগিয়ে দেয় তাঁদের।

॥ ১০॥

দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে এসে ঔষধের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা খালি টোটোগুলির একটির উঠে মুখোমুখি বসলেন বনমালী ও মনোরমা এবং টোটোওয়ালাকে বাড়ির দিকে যাবার নির্দেশ দিলেন। যেতে যেতে মনোরমা স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন যে তাঁর চোখে-মুখে একটা অনাবিল তৃপ্তি ও প্রশান্তির আবেশ যেন ছড়িয়ে রয়েছে। অসুখটা ধরা পড়ার পর অনেকদিন তাঁকে এত প্রাণোচ্ছল দেখেননি তিনি। যেন বনমালী কোন অত্যন্ত মূল্যবান কিছু পেয়েছেন এরকম মনে হল মনোরমার। আদুরে গলায় তিনি স্বামীকে বললেন, "শোনো, তোমার এই ডাক্তার ছাত্রটি কিন্তু অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা। যেমন ভদ্র, তেমনি নম্র আর বিনয়ী ব্যবহার আর তার থেকেও বড় কথা যে, টাকার উপর ওর কোন লোভ আছে বলে মনে হল না। আজকাল যা শুনি, তাতে মনে হয় ডাক্তাররা সেরকম রুগী পেলে ছিনে জোঁকের মত সমস্ত অর্থ শুষে নিয়ে রোগীকে হয়ত শারীরিকভাবে সুস্থ করে কিন্তু আর্থিকভাবে অসুস্থ করে দেয়। সমর সে রকম নয় বলেই মনে হল। ওকে একদিন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে কেমন হয়?"

ঈষৎ হেসে বনমালী বললেন, "রমা, তুমি ঠিকই বলেছ। আসলে কি জানো, সাগরের নীচে ঝিনুক থাকে আমরা জানি কিন্তু সব ঝিনুকে মুক্তো থাকে না। যেটার থাকে সেটা অমূল্য দ্রব্য হিসাবে পরিগণিত হয়। সেইরকম বহু ছাত্রকে আমি পড়িয়েছি, অনেককে একই উপদেশই দিয়েছি এবং একই শিক্ষাও দিয়েছি কিন্তু তাদের সবাই প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে পারে নি। কেউ রয়েছে আধা মানুষ, কেউ বা অমানুষ আবার কেউ বা আক্ষরিক অর্থে মানুষ। কিন্তু প্রকৃত মানুষ যে কয়জন হয়ত হয়েছে, সমর তাদের একজন। আমার কাছে ও ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো। তাই আমার কাছে এই প্রাপ্তি অমূল্য। তুমি প্রায়ই আমাকে খোঁটা দিতে যে "এত এত ছাত্র পড়িয়ে জীবনে তুমি কি পেলে?" আজ যে অমূল্য রত্নের সন্ধান আমি পেলাম এটাই আমার জীবনের পরম মূল্যবান প্রাপ্তি। এর সঙ্গে ব্যাঙ্কের সোনাদানা, মণিমাণিক্য বা আরো মূল্যবান অন্য বস্তুর কোন তুলনা হয় না বা করা যায় না। একজন গুরুর কাছে এই প্রাপ্তিই তাঁর জীবনের বহু আকাঙ্খিত প্রাপ্তি। আর সেই প্রাপ্তিই আজ আমি লাভ করেছি।" বনমালী ও মনোরমার দুজনেরই চোখের কোণায় জল জমে চিকচিক করতে লাগল। টোটো এসে থামল বাড়ীর সামনে।

আনন্দ

অমিত পন্ডিত
(তৃতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স)

আর মাত্র কয়েকদিন পর বাঙালীর সব থেকে বড়ো উৎসব, অর্থাৎ শারদোৎসব। এই উৎসবে সবাই প্রাণ খুলে মনের সুখে আনন্দ করতে চাই। এই উৎসবের অপেক্ষায় যদি কেউ সবার থেকে বেশী প্রতীক্ষায় থাকে, সে কিশোর ও বালক বয়সের ছেলে-মেয়েরা। এই রকমই যেন একটি ছেলে আনন্দ। কিন্তু আনন্দের আনন্দটা যেন অন্যরকম, হয়তো মনের আনন্দ বা অন্য কিছু। বয়স প্রায় ১৩-১৪ হবে। পড়াশুনায় মেধাবী।

আনন্দের বাবার বড়ো ইচ্ছা যে তার ছেলে বড়ো হয়ে ডাক্তার হবে; আর সর্বসাধারণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। অন্যদিকে আনন্দের মায়ের ইচ্ছা ছিল, ছেলে ভবিষ্যতে একটি ভালো শিক্ষক হবে এবং সবাইকে শিক্ষা প্রদান করবে, যাতে মুর্খতার মাত্রা হ্রাস হয়। কিন্তু, আনন্দের বড়ো হয়ে কী হবার ইচ্ছা বা সে কোন দিকে বেশী মনোযোগী, সেটি এক বারের জন্যও কেউ জেনে নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। তার বাবা-মাও নয়। আনন্দ ছোট্ট একটি ছেলে হ'লেও মনে ভয় জন্ম নিয়ে নেওয়ায় সেও কোনো দিনও প্রকাশ করতে পারেনি। তবে বলতেই হয় যে, আনন্দের মা-বাবার ইচ্ছে খুবই ভালো; উজ্জ্বল প্রকৃতির ভবিষ্যৎ, সমাজের সুভাবক-সুচিন্তা সবই তাঁদের ইচ্ছায় উজ্জ্বল প্রকাশ পাচ্ছিল।

কিন্তু আনন্দের এরূপ ভাবনা চিন্তায় তার মা-বাবা তাকে সমাজ ও পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ছিল, তারা মনে করত কেবল মাত্র পুঁথিগত মাধ্যমের মধ্যে দিয়েই আনন্দকে তারা গড়ে তুলবে। আনন্দের প্রতিদিন কাটত এই রকম ভাবে—সকালে বাবা মা সবার সাথে ঘুম থেকে উঠে মা নিজের সকালের কাজকর্ম বাদ দিয়ে কিছুটা বিছানায় বসেই পড়িয়ে নিত, বাবা মনিংওয়ার্ক থেকে ফেরার আগে পর্যন্ত আনন্দ তার মায়ের কাছে পড়তে বসত, তার পর বাবা আসত ও আনন্দ বাবার সাথে ব্রাশ করে ফ্রেশ হয়ে যেত। এই সময়ের মধ্যে আনন্দের মা তাদের খাবার তৈরী করে ব্যাগে টিফিন দিয়ে দিত। খাবার পর বাবা আনন্দকে গাড়ি ক'রে স্কুলে ছেড়ে দিত, তার পর নিজের অফিসে যেত। আনন্দ স্কুলে গিয়ে সবার সাথে মিশত না, সবাই যখন স্কুলে হইচই করছে, তখন আনন্দ যেন একধারে বসে মনোযোগ সহকারে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত আর ভাবত সেও হই চই করলে খুবই মজা হত; কিন্তু এরূপ হত না। আনন্দ নামটিও যেন তার সাথে খুব একটা সার্থকতা পেত না। সে তার স্কুলে যেত কেবল পড়াশুনারই জন্য কারণ, সামনেই পূজোর আগামনী। একটি বড়ো মাপের আনন্দের ব্যাপার। এর পর স্কুলের শেষে তাকে আবার তাঁর মাও তাদের এক প্রতিবেশীনির সাথে পার্কে গিয়ে বসত। মা মেতে যেতেন গল্পে; আর মায়ের সঙ্গীদের ছেলেদের সাথে আনন্দ খেলা করতে গেলেই মা উচ্চস্বরে বলতেন, ও দিকে যেও না, নইলে আমি আবার ধরে আনব, চুপ করে বসে যা কিছু করো। বেশী লাফালাফি নয়। এরকম ভাবে কিছু সময় কাটার পর তার বাড়ি ফিরত, তখন তার বাবা অফিস থেকে আসত, আর বলত, আনন্দ আজ স্কুলে কোনো অসুবিধা হয়নি তো ভালো ক'রে পড়ো; তোমাকে ডাক্তার হ'তে হবে।

আনন্দের বাবা ও মায়ের কথাগুলো মাঝে মাঝে তার কানে বেজে উঠত! ডাক্তার হ'তে হবে...! শিক্ষক হ'তে হবে.....! বাবার অফিসও পুজোর ছুটির জন্য এবার বন্ধ বাবা ও মায়ের সাথে পুজোর কেনাকাটা করার জন্য দোকানে গেলেও যেন নিজের কোনো ইচ্ছার প্রকাশ আনন্দ করত না। বাবা-মা যে পোশাকটি দেখে বলত এটা নিবি, আনন্দ সেটাও বলত না, কেবল মাথা নাড়ত যার উত্তর হতো হ্যাঁ। পূজোতে সব ছেলে যেমন বাজি কেনার জন্য তোড়জোড় লাগাত, আনন্দ এই রকম ছিল না, কেবল অন্যরা কিনছে এটাই দেখত আর হালকা মুচকি হাসি হাসত। তার মনেও এইসব জিনিস কেনা

ইচ্ছা জাগলেও কখনো মা-বাবার কাছে প্রকাশ করত না। করলে তারা বলত যে, বাজি ফাটালে পরিবেশ দূষণ হবে। তোমার হাত লাগাতেও পারে। একটি বাচ্চার মনের আনন্দ তারা হয়তো মা-বাবা হয়েও বুঝতে পারে নি। কেবল ভবিষ্যতের চিন্তাটাই তাদের কাছে সবার উপরে। কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তার জন্য আনন্দের বর্তমান যে কেমন কাটছে, তা' তারা চোখের সামনে দেখেও দেখত না আনন্দের জীবনে এই বয়সে হয়তো কোনো আনন্দই আসে নি; যার মূল কারণ কী বলা যায় না, আর ভবিষ্যতের চিন্তা বর্তমানকে ভালো-মন্দ দুই করতে পারে।

আলোচনা সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং সঞ্চালক কর্তৃক প্রদীপ প্রজ্জ্বলন।

আবহমান

মণীষা মুখার্জ্জী
তৃতীয় বর্ষ, ইংরাজী

(ক্যাফেটেরিয়ার একটি টেবিল ঘিরে শঙ্খ, অহনা আর সায়েরী)

শঙ্খ ঃ কী ব্যাপার রে? শুনলাম, বিয়ের জন্য কাকিমা তোকে রাজি করিয়ে নিয়েছেন?

অহনা ঃ কী যা - তা বলছিস?

সায়েরী ঃ হ্যাঁ। সেরকমই ব্যাপার। বাবা পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল. সেটা থেকে একটা response এসেছে। ছেলেটা I.T. Firm-এ আছে। উজানদার আত্মীয় হয়। পরিবারটি নাকি ভালো। ওরা কাল দেখতে আসবেন আমাকে।

অহনা ঃ তোর তো এসব arranged marriage-এর ব্যাপারে আপত্তি ছিল।

সায়েরী ঃ আপত্তি ক'রে কোনো লাভ নেই তো। কোনো reason নেই আপত্তির। আমি তো involved নই।

অহনাঃ (সায়েরীর হাতের ওপর হাত রেখে বলল) সত্যি বল্, তুই এখনও দুর্নিবারের অপেক্ষা করিস না?

(সায়েরী হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল) ঃ এবার উঠি রে, অনেক দেরী হয়ে গেল। ক্যাফেটেরিয়া প্রায় ফাঁকা হতে চলেছে। (সায়েরী বেরিয়ে যায়)

শঙ্খ ঃ ছাড় তো ঐ বাঁদরটার গল্প। ওর সঙ্গে কোনো chemistry-ই ছিল না সায়েরীর।

অহনা ঃ জেদটা কারো কোনো অংশে কম ছিল না ওরা atleast একবার দেখা করতে পারতো, সব অভিমান ভুলে। দুর্নিবার তো তখন কাজ আর কেরিয়ার নিয়ে পাগল ছিল। আর সায়েরীরও তখন final year পরীক্ষা—শিরে সংক্রান্তি। তখন দুর্নিবারের response না করা গুলোকে ওর negiect করা ব'লে মনে হয়েছিল।

(পরদিন সকাল, সায়েরীদের বাড়িতে)

মা ঃ রীতি (সায়েরীর ডাক নাম) শাড়িটা প'রে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসো। (মা প্রায় ধমকের স্বরে ব'লে গেল।)

বাবা ঃ Arranged marriage করছো, তাতে কী হয়েছে? নিজেকে showpiece না ভেবে বরং মনে করো যে, তুমি আমার রাজকন্যা, তাই রাজপুত্র স্বয়ং রাজ্যপাট সামলে শুধু তোমার জন্য স্বয়ম্বরে এসেছে (বাবার গলায় নরম সুর।)

সায়েরী ঃ (স্বগতোক্তি) অবশ্য দুর্নিও বলেছিল "wait .....আমি আসবো।" তবে প্রেম কি আর ধৈর্য্যের বাঁধ মানে? তবু অপেক্ষায় ছিলাম...। একটা সময় যখন দুজনেই career building-এ খুব ব্যস্ত, একটা নিঃশ্বাস বেশী ফেলার সময় নেই,... তখনও এক আবহমান অপেক্ষার আবেশ নিজের অজান্তেই বসে যেত আমার জীবনস্রোতে...।

আজকেরটা হলুদ শাড়ি, সেদিনেরটা ছিল নীল রঙের..

তিতির দি আর উজানদার বিয়ে। বাসর রাত জাগা পালা। উজানদার মামার ছেলে দুর্নিবার, গানের আসরে guitar হাতে জাঁকিয়ে বসেছে। আমারও গানের গলা ভালো, যে কোনো ধরনের গানেই খুব সাবলীল লড়াইয়ের ময়দানে গানের গুঁতোয় দু'জনেই একে অপরকে টক্কর দিচ্ছিলাম।

'ভ' এক..... 'ভ' দুই..... 'ভ' তিন..

দুর্নিবার গান শুরু করল, —

"ভেজা সন্ধ্যা অঝোর বৃষ্টি, দূর আকাশে মেঘে প্রতিধ্বনি; বদলে গিয়েছে আকাশ, বইছে বাতাস; আড়ালে দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি"।...

এক অন্যরকম অনুভূতি হ'ল আমার! সেই রাতে

মাদের মধ্যে এক আলো-আঁধারী পরিচয় হয়ে গেল।

তারপর...

"নিবিড় ভালোবাসা"..

অপেক্ষা..

দীর্ঘশ্বাস...।

আজ এখন আর এসব ভেবে কি হবে? তার চেয়ে -বাবা যখন বলেছে, তখন, দেখাই যাক না, যা আছে দৃষ্টে।

(সায়েরী ঘরে গিয়ে শাড়িটা পরে সিড়ি দিয়ে নামছে। ড়ির ওপর থেকেই ছেলেটার appearance-টা দেখার চেষ্টা করল সে, কিন্তু বাবা এমনভাবে ওর মুখ আড়াল ক'রে বসে আছে যে, তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না। সিঁড়ি দিয়ে নেমেছে সায়েরী বাবা ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করল)

বাবা : তোমার নাম কী?—

ছেলেটা : দুর্নিবার সাহা

(সায়েরীর পা আর চলছে না, বুকের মধ্যে সে ব্যথাটা আবার অনুভব করছে সে...ব্যথাই কি!...

আবার যেন শুনতে পাচ্ছে —

নেপথ্যে : ডাকছে সময় পিছু, বলবে কি মন কিছু

(গানটা চলতে লাগল। মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে নিভে গেল

সুন্দরবনে পাঁচ দিনের ভ্রমণ

পার্থ মন্ডল
(দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স)

আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর Environmental Project - এর জন্য সুন্দরবনের একটি নির্জন দ্বীপে গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন তখনকার দুই জন গাইড, যাঁরা দ্বীপটির প্রায় সবজায়গাই চেনাবে। আমি এবং আমার বন্ধুদের উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গিয়ে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সুন্দরবনের নদী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবো। আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল এখানকার রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং কুমির দেখার। আমরা ঠিক করলাম, Project শেষ করে আমরা সুন্দরবন অঞ্চল ঘুরে দেখব। আমাদের Project শেষ হ'লো এবং আমরা সুন্দরবন দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

যখন আমরা ঘুরছিলাম তখন হঠাৎই নদীতে একটি বড়ো জাহাজ গেল। সেটি মালবাহী জাহাজ ছিল। আমরা সেই দৃশ্য দেখে খুব আনন্দিত হলাম। নদীর পাড়ের ঘাটে দাঁড়িয়ে অন্য সবাই 'সেলফি'তে মজেছিল। যখন আমাদের প্রায় সব জায়গা দেখা হয়েগিয়েছিল তখন একটি নির্জন দ্বীপে আমরা বাঘ দেখতে গেলাম। সেখানে বাঘের আক্রমণে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং অনেক মানুষ মৃত্যুর সামনে থেকে বেঁচেও ফিরেছে। এমন মানুষদের দেখে আমাদের কাছে এর ঘটনার অভিজ্ঞতা শুনে যখন আমরা বাড়ি ফিরবার জন্য বনের রাস্তা দিয়ে আসছিলাম। তখনই ঘটে গেল এক অপ্রীতিকর ঘটনা। হঠাৎ খুব জোরে বাতাস বইতে লাগল। নীল আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। ফলে বিকেল বেলাকেই মনে হচ্ছিল যেন মধ্যরাত্রি।

এমন অবস্থায় আমরা দ্রুত দৌড়তে শুরু করলাম, কোনরকম ভাবে সেই নির্জন দ্বীপ থেকে বের হয়ে আসতে পারলে খুব ভালো। আমরা যখন দ্রুত যাচ্ছিলাম, তখন আমার পায়ে আঘাত পেলাম এবং আমি পড়ে গেলাম। আমি পড়ে গেছি এটা আমার বন্ধুরা জানত না। বন্ধুরা সবাই নদীর পাড়ে গিয়ে পৌঁছালো। সেখানে একটি নৌকা ছিল। বন্ধুরা তাতে চেপে পার হয়ে গেল। কিন্তু আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি মোবাইলে ফোন ও করতে পারছিলাম না। কারণ সেখানে নেট ওয়ার্ক কাজ করছিল না। এদিকে রাত ঘনিয়ে আসছিল আমার এই পরিস্থিতি দেখে এই কথাটা মনে হওয়া স্বাভাবিক 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়'। এই প্রবাদের সঙ্গে আমার বর্তমান অবস্থা একদম এক। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তার উপর আমার কাছে কিছু ছিল না এবং আমি দ্বীপ থেকে বাইরে যাওয়ার রাস্তাও গুলিয়ে ফেলেছিলাম। আমি একদম একা নির্জন এলাকায়। আমি কিছুই ভাবতে পারছিলামনা। শুধুই ছট্‌ফট্ করছিলাম। আমার অবস্থা অনেকটা জল ছাড়া মাছের মতো হয়ে গিয়েছিল।

আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখানে ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমিরের অবস্থান। তারা যেকোন সময় আমাকে মেরে ফেলতে পারে। আমি কীভাবে এখান থেকে বাড়ি ফিরব এবং কীভাবে আমার বাবা, মা, ভাইদের সঙ্গে দেখা করবো। আমার চোখে জল চলে এল। আমি কোনরকম ক'রে নিজেকে সামলিয়ে একটি গাছের ওপর উঠলাম। আমি ভাবলাম গাছের ওপর উঠলে বাঘ এবং কুমির থেকে রক্ষা পেতেও পারি। আমি মোবাইল জ্বালিয়ে চারিদিক দেখতে লাগলাম। একবার একটু ঘুমিয়েছিলাম বাঘের একটি ভয়ঙ্কর গর্জন আমাকে মনে করিয়ে দিল, আমি বনে আছি। তারপর ক্রমশ বাঘের গর্জন আমাকে একটুকুও ঘুমোতে দেয়নি। যে কালো মেঘটি এতক্ষণ গর্জন করছিল এবার বৃষ্টি শুরু হল।

ওদিকে আমার বন্ধুরা খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলো, আমি নির্জন দ্বীপ থেকে ফিরিনি। তারা আমাকে খুঁজতে আসার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এই রাত্রিবেলায়

অন্ধকারে, তার উপর প্রচন্ড বৃষ্টি, তাদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার এখন নদী পারের জন্য নৌকাও থাকবে না। তাই তারা ঠিক করল পরের দিন সকালে তারা আমাকে খুঁজতে বেরোবে।

এদিকে, আমার চোখে সারারাত ঘুম নেই।

আমি ভাবছিলাম, এখানে প্রথম তিনদিন কতইনা সুখে কাটিয়েছিলাম, বন্ধুদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, ঘুরে বেড়ানো, আরও কত কী। এখন আমি ভাবছিলাম, আর কোনদিন আমি আমার বন্ধুদেরকে দেখতে পাব কী না। এই প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। এগুলি ভাবতে ভাবতেই আমি হঠাৎ দেখলাম, আমার আশ্রয়দাতা গাছের নীচে একটি বাঘ এসে বসে আছে। আমি তাড়াতাড়ি নিজের লাইট অফ করে মুখ বুজে বসে রইলাম। কালো অন্ধকার রাত্রে আমি এখনও বাঘটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমরা প্রথম তিনদিন যত মজা করেছিলাম তা একমুহূর্তে শেষ হয়ে গেল। এগুলি ভাবতে ভাবতেই সকাল হয় গেল এবং সুন্দরবনে আমার চারদিন হয়ে গেল। আমরা সবাই পাঁচদিনের ভ্রমণে এসেছিলাম। আমি যদি আজ বাড়ি না যাই, তাহলে বাড়ির লোকজন চিন্তা করবে। তাই, আমি তাড়াতাড়ি রাস্তা খোঁজার জন্য এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলাম। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না, কোথায় যাব। আমি চারিদিক ঘুরে দেখছিলাম, কিন্তু, কাউকেই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল আমি বার বার পথ ভুল করছি। তাই আমি প্রত্যেক গাছে তীর চিহ্ন বানিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এই বুদ্ধিটা আমার কাজে লেগে ছিল। এই চিহ্ন দেখে আমার বন্ধুরা আমার কাছে পৌঁছাল এবং আমার তল্পি-তল্পা গুছিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ভাগ্যে ছিল, তাই বাবা-মার কাছে পৌঁছে গেলাম।

ভিন্ন ভাবনা

স্নেহাশিস সরকার
তৃতীয় বর্ষ

এখন ২০তে পদার্পন, ভেসে আসে ছোটবেলার চিন্তা, 'ছোট' শব্দটি যেন দূরই হতে চাইত না, জোর ক'রে স্কুলে যাওয়া, আর মাঝে মাঝে শরীর খারাপের অজুহাতে এই কঠিনতম কাজ থেকে নিস্কৃতি। উচু ক্লাসের ছেলেরা বেঞ্চে বসে, আমি সতরঞ্চিতে; কবে বেঞ্চে বসতে পারব, শুধু সেই ভাবনাই মনে ঘুর ঘুর করত স্কুলে। সবাই আমাকে তুইতুকারি করত। একমাত্র বাড়ীর কাজের লোকজনেরা 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করত, যা তৎকালীন জীবনে আমার বিশাল পাওয়া। তাই, তারা আমার ভীষণ প্রিয় ছিল। ঐ সময় বিদ্যালয়ের ভূমিকাই বেশি ছিল। বেশীরভাগ কাজকর্ম চিন্তাভাবনা, সবকিছুই তাকে কেন্দ্র ক'রে। শিক্ষক মহাশয়গণ বেশি পড়া দিলেই হয়ে যেতেন শত্রু। শুরুহত পরের দিনের প্রার্থনা। প্রার্থনার ভাষাটা বেশ মনে পড়ে— 'ঠাকুর! ঐ শিক্ষক যেন আজ না আসেন'। ঠাকুর তাঁর ভক্তের কথা কোনদিন শুনতেন, আবার কোনদিন শুনতেন না। যেদিন শুনতেন, সেদিন বাহবা পেতেন, 'বা! আজ ঠাকুর কথা শুনেছেন! এই ভাবনা প্রায়ই ভাবতাম যে, স্যারেরা পড়াচ্ছেন এবং পড়া দিচ্ছেন সেই পড়া কত কষ্ট ক'রে প্রতিদিন করছি। প্রত্যহ পড়তেও যাচ্ছি, স্যারতো আসছেন। মাসের শেষে মাইনে পাচ্ছেন। কিন্তু আমিতো কোন মাইনে বা টাকা পাচ্ছিনা! তাই, আমি কেন যাব?

একটু বয়স বাড়ল; তবে কারো কাছেই শুনতে পেতাম না—বড় হয়েছি! একথা, শুধুই ভাবতাম, কবে বড় হব। আর ভাবতাম, কেন মেয়ে হলামনা। মেয়ে হ'লে কত সুন্দর সুন্দর গয়না, পোশাক, টিপ পরতে পেতাম। হতে যাচ্ছে বাড়ীর টাকায় তবে ২৫ পয়সা থেকে খুব বেশি হলে ৫টাকা। তবে তার পিছনে কারণ সর্বদাই থাকত। তাই টাকাটি দেখা মাত্রই নিজের বলে পরিগণিত হল না। প্রথমে সেটির স্থান পরিবর্তন, পরে সেটির খোঁজা হলে সঙ্গে সঙ্গে খুঁজতে সাহায্য করা এবং আনন্দের সঙ্গে খুঁজে দেওয়া। আর খোঁজা না হলেতো সোনায়-সোহাগা, হাতে পাওয়া মাত্রই শুরু হত কোন খাতে তা ব্যয় হবে, তার পরিকল্পনা।

তখনকার একটা কাজ আমার কাছে ভীষণ কষ্টকর ব'লে মনে হ'ত। সেটি হ'ল দুপুরে ঘুমানো, কিন্তু মাঝেমধ্যে এক চিন্তাই বিরাজিত, কবে বড় হব। সবাই কবে বলবে, বড় হয়ে গেছিস। আর কবেই বা বড়র মর্যাদা পাব।

কোনো অনুষ্ঠানে খেতে গিয়ে সব শেষে মিষ্টি দেওয়ার সময় শুরু হ'ত। নিজেকে বড় করে দেখানোর নানা কায়দা করতাম। মাথাটা যতটা সম্ভব উচু করতাম, যাতে বড়দের সামন মিষ্টি পাই। তাতে খেতে পারি আর না পারি। হাফ্ প্যান্ট পরতে চাইতাম না ফুল প্যান্ট পরবার প্রস্তাব প্রায়শই রাখতাম। দুঃখ পেতাম বাসে ভাড়া না চাইলে। ধীরে ধীরে মনে কত প্রশ্নইনা বাঁসা বাঁধতে লাগল। কিছু কিছু জিজ্ঞাসা মনকে ভাবিয়েছে। একটা মজার বিষয় সেই সময়ের ভাবনায় ছিল, বিয়ে মানে তখন বুঝতাম, একটি ছেলে পুতুলের সাথে একটি মেয়ে পুতুলের বিয়ে। তাতে ছেলে পুতুলটি উচ্চতায় বা বয়সে বড় হবে। ঠিক বৌ- জামাই মানেও তাই একজন ছেলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরবে, আর মেয়েটি বেনারসি পরবে। ভোজ খাইয়ে দেবে, ঠাকুর মশায় পুজো করবেন, আর বিয়ে হয়ে যাবে। ভাবতাম, আমারওতো একদিন বিয়ে হবে, কিন্তু আমারত সাত বছর বয়স, তাই আমার যে বৌ হবে, সেতো এখনও জন্মায়নি। কেননা দাদু-ঠাকুরমার বয়সে ৮ বছরের ফারাক ছিল সেটা আমার জনাছিল।

কিন্তু আজ হঠাৎই বড় হয়ে গেছি, কলেজে পড়ছি, 'তুমি', 'আপনি' কল্পনার সম্বোধন সূচক শব্দগুলির সম্মুখিন হচ্ছি, ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা এখন চেষ্টা না করতেই চলে এসেছে। মানবিকতা, অমানবিকতা, এই

সবের উপলব্ধি পাচ্ছি, বড় হওয়ার সুবাদে কর্তব্যের সম্মুখিন হচ্ছি যা কোন কারণে বিঘ্নিত হ'লে চূড়ান্ত দোষের কবলে পড়ছি, মনে চিন্তার অবকাশ হচ্ছে সুদূর ভবিষ্যতে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি কখন মনকে লঘু করে তুলছে, সামান্য হতাশার শিকারও হচ্ছি। সর্বদা একচিন্তাই বিরাজিত, এ জীবনে কবে পায়ের নিচে একটু মাটি পাব। আর কবেই বা ওপরে ওঠার সিঁড়ি পাব। আদৌ উঠতে পারবতো! সময়ের মূল্যতার কথা এ বয়সে মনকে সর্বদাই ভাবিত করে।

তখনকার জীবন আর এখনকার জীবন, এ যেন এক ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনার পার্থক্য। একটাই মন, তাই, তৎকালীন বহু চিন্তাধারা আজ মন থেকে চলে গেছে। পরিস্থিতির চাপে ব্যর্থতার শিকার হওয়ার জন্য সেই চিন্তার বাসা অনেকাংশ ছেড়ে পড়েছে। তখনকার ভাবনা মতো মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করলে আর কি পরিণতির শিকার হতাম! তা ভাবলে কষ্ট লাগে। এমনকি, ঈশ্বরকে অভিযোগও জানাই, চূড়ান্ত অমানবিকতার দিকে তাকিয়ে। ছেলে হওয়ার সুবাদে হয়তো সেই ব্যারিকেড সামনে নেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার জন্য কি কিছু করতে পারলাম! আর পরবর্তীতে কি কিছু করতে পারব? এই ভাবনাই আমাকে ভাবাচ্ছে কতকগুলি বছর ধরে। আমি ক্রমশ বুড়ো হচ্ছি, বড়ো হচ্ছি কি?

পরীক্ষার উত্তরপত্র এবং হিউমার

ড. চৈতন্য বিশ্বাস

'হিউমার' হ'ল এক প্রকার হাস্যরস, যার সঙ্গে মিশে থাকে চোখের জলও। যে সকল শিক্ষক এখন সাধারণ পাঠ্যক্রমের পরীক্ষার খাতা দেখেন, তাঁরা এই হিউমার জাতীয় হাস্যরসের আস্বাদন ক'রে থাকেন। এখনকার ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতায়, উত্তরের মধ্যে এমন অনেক বিষয় থাকে, যা হাসিরই খোরাক হয়ে ওঠে। আর সেই হাসির সঙ্গেই মিশে যায় এক প্রকার কষ্টবোধ, এক প্রকার সংকোচ! কারণ, উত্তরপত্রের সেই হাসির বিষয় গুলোতো আসলে পরীক্ষার্থীদের অন্যায় পথ অবলম্বনের নমুনা; আর তারা তো পরীক্ষকদেরই ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের নজর এড়িয়ে অসৎ পথে কার্যসিদ্ধ করতে চাচ্ছে, এটা জানতে পেরে কোনো শিক্ষক তো গৌরব অনুভব করতে পারেন না! বরং, তাঁর চোখে জল আসবারই কথা। লজ্জাবোধ হবারই কথা!

পরীক্ষার সময় পাশ করবার তাগিদে কিছু মেধাহীন ছাত্র-ছাত্রীর যে অসৎ উপায় অবলম্বন করার প্রবণতা থাকে, তা' অস্বীকার করা যাবে না। এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আগে কম ছিল, এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। এর জন্য দায়ী শিক্ষকরা নন; দায়ী বর্তমান 'এডুকেসন সিস্টেম'। সর্বশিক্ষা লক্ষ্য নিয়ে সর্বস্তরের মানুষকে শিক্ষাক্ষেত্রে টেনে আনতে গিয়ে সরকার যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছে, তা' প্রশংসনীয় হ'লেও শিক্ষার মান নিম্নমুখী হয়েছে। মিড্-ডে-মিল দিয়ে, স্কুলের পোশাক দিয়ে, বিনামূলে শিক্ষাউপকরণ দিয়ে, আরো অনেক রকম সহায্য দিয়ে দরিদ্র, অসহায় পরিবারগুলির ছেলে-মেয়েদের শিক্ষামুখী করার চেষ্টা হলেও অধিকাংশ ছেলেমেয়েই শিক্ষামুখী হয়নি। বিনা পয়সায় কিছু পাওয়ার অধিকারবোধটাই তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও প্রথম শিক্ষা পাওয়ার থেকে বস্তু পাওয়ার দিকে ঝোঁক বেড়েছে। তাই মিড্-ডে-মিল নিয়ে যত অভিযোগই উঠুক, শিক্ষার গাফিলতি নিয়ে কোন অভিযোগ ওঠে না।

পাশ-ফেল প্রথার গুরুত্ব না থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে পড়াশোনার বিষয় মুখস্থ করার অভ্যাসটাই ঘুচে গিয়েছে। মুখস্থ করা বা মনে রাখার অভ্যাসটাও যে একটা ভালো অভ্যাস, এটা যেন সবাই ভুলেই গিয়েছে। শিক্ষার অনুকূল ভালো ভালো অভ্যাস বা অনুশীলনগুলো না ক'রেই ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিকে, কলেজে পৌঁছে যাচ্ছে। এ সব ক্ষেত্রে অবশ্যই পাশ-ফেল ব্যবস্থা আছে। পাশের হার বাড়িয়ে শিক্ষার উন্নয়নের গৌরব উপভোগ করতে গিয়ে প্রশ্নপত্রের মডেল পরিবর্তন করতে করতে এমন ক'রে তোলা হয়েছে যে, কিছুমাত্র পড়াশোনা না ক'রেও, কোনো উত্তর না জেনেও পাশ করা যায়। শুধু ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে পিছনে তাকিয়ে নিজের উত্তরপত্রে কিছু লিখতে পারলেই হ'ল। এই ভাবেই উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পেরিয়ে এসে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে কলেজে ভর্তি হচ্ছে। এখানেও যারা ভর্তি হচ্ছে তারা যে সবাই শিক্ষার জন্যই ভর্তি হচ্ছে, এমন কথা বলা যাবে না। এখানেও ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হয় অন্য কিছু পাবার জন্য। তাই, ভর্তির পর থেকে অফিসের সামনে তারা যতটা ভিড় বাড়ায়, ক্লাস ঘরে ততটা বাড়ায় না।

সাম্মানিক শ্রেণীতে যারা ভর্তি হয়, তাদের মধ্যে অনেকেরই পড়াশোনায়, ভালো রেজাল্ট করবার মানসিকতা এবং আগ্রহ আছে; তাই তারা ক্লাসেও বসে, পড়াশোনাও করে, বইপত্রও কেনে। কিন্তু, সাধারণ শ্রেণীতে যারা ভর্তি হয়, তাদের দশ শতাংশও নিয়মিত ক্লাসে বসে না। শিক্ষকের মুখ থেকে কিছু শোনে না, শেখে না। কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে চায়। আর সেটা চায় অসৎ উপায়েই, অভ্যস্ত পথে পাশের জনের খাতা দেখে টুকেই। যদি পাশে প্রকৃত উত্তর জানা ভালোছেলে বা মেয়ে কেউ না থাকে, তাহলে উত্তরগুলো

পাল্টাতে পাল্টাতে কেমন হাস্যকর হয়ে ওঠে, সেটাই এখানে তুলে ধরব।

এখনকার স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এত বেড়েছে যে, হাতে ধ'রে তাদের হাতের লেখা ভালো করার কথা কোনো শিক্ষক ভাবেন না। আমাদের সময় আমরা স্কুলের শিক্ষকদের মুখে শুনতাম, 'হাতের লেখা' এমনই এক সম্পদ, যা হারায় না, চুরি হয় না, কেড়ে নেওয়াও যায়না। হাতের লেখা ভালো করার জন্যই ছাত্র-ছাত্রীদের 'হাতের লেখার খাতা' নামে একটা খাতা করতে হ'ত। সেই খাতায় রোজ এক-দু'পাতা লিখে ক্লাস টিচারকে দিয়ে স্বাক্ষর করাতে হ'ত। যার হাতের লেখা সব থেকে ভালো সে পুরস্কারও পেত। এখন আর সেই সব 'ঝামেলা'য় শিক্ষকরা জড়াতে চান না। তাই এমনিতে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর হাতের লেখা পাঠযোগ্য হয় না; তার উপর পরীক্ষার সময় তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে তারা যা লেখে, তা' দুর্বোধ্য হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। সেই দুর্বোধ্য লেখা দেখেই পাশের পরীক্ষার্থী অনুমান ক'রে অন্য কথা লিখে ফেলে। সেটা আদৌ প্রশ্নের উত্তর হবার যোগ্য কিনা, সেটা বিচার করবার মতো বোধ-বুদ্ধিও তো তাদের অনেকেরই থাকে না!

এক কথা থেকে অন্য কথায় যেতে যেতে কথাগুলি শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছে যায়, তারই কিছু নমুনা এখানে দেব ঃ সাহিত্যের ইতিহাসের উত্তর লিখতে গিয়ে প্রথম জন লিখেছে—'বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিবাহ হয়।' দেখে লেখা পরীক্ষার্থীদের খাতায় কথাটা রূপ নিল 'বেলুড়ের সঙ্গে দক্ষিণপারের বিরাট জয়।' এই বাক্যটা প'ড়ে কোনো বুদ্ধিমান পরীক্ষার্থীর হয়তো মনে হয়েছে, জয়টা চাঁদ সদাগর আর মনসার লড়াইয়ের। সেই 'লড়াই' শব্দটা আগের পরীক্ষার্থী লিখতে ভুলে গেছে। তাই, বুদ্ধিমান পরীক্ষার্থী লিখল, 'বেলুড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে দক্ষিণপারের বিরাট জয়!' পরীক্ষার খাতায় এই বাক্যটাই দেখাদেখি ক'রে লিখে ফেলল বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থী! সাহিত্যের ইতিহাসেরই অন্য একটি উত্তরে এক পরীক্ষার্থী লিখেছে, 'কৃষ্ণের উপর কংসের আক্রোশ প্রথম থেকেই।' দেখে লেখা পরীক্ষার্থী তার খাতায় লিখল, 'কৃষির উপর বাংলার আক্রোশ প্রথম থেকেই।'

সাহিত্যের ইতিহাসের অর একটি উত্তরে লেখা হয়েছে, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে চর্যাপদের প্রথম প্রকাশ।' —এটা অন্যের খাতায় হয়ে গেল—'বন্দীর সহিত পরিচয়ে বামাপদর প্রথম প্রণয়।' প্রথমজন লিখল, 'রাধার সর্বক্ষণের সঙ্গী বড়াই (বরাই) তখন কৃষ্ণের পক্ষ নিল।' দেখে লেখা পরীক্ষার্থী লিখল, 'বাবার সর্বক্ষণের সঙ্গী বরাহ তখন কৃষির পদ্ম নিল।' মধুসূদন দত্তের দু'টি প্রহসনের নাম লিখতে গিয়ে এক পরীক্ষার্থী লিখেছে—'বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ', এবং 'একেই কি বলে সভতা?' অন্য পরীক্ষার্থীরা লিখল, 'বুড়ো শালিদের ঘরে বৌ' এবং 'একে একে বসে সভার তারা'।

ভাষাতত্ত্বের উত্তরেও এমন হাস্যকর কথা, চমকে যাবার মতো কথা বহু পাওয়া যায়। একজনের খাতায় হয়তো লেখা হয়েছে—কথ্য বাংলায় তদ্ভব শব্দই বেশি ব্যবহৃত হয়।' অন্যজন সেটা দেখে লিখল, 'মধ্য বাংলায় তাদ্ভব শব্দই বেশি ব্যবহৃত হয়।' অনভিজ্ঞ পরীক্ষক এমন উত্তর পড়ে তো চমকে উঠতেই পারেন।

সকল শ্রেণীর উত্তরের মধ্যেই পরীক্ষকগণ এমন অনেক কথা বা বাক্য পেয়ে থাকবেন, যার অর্থ বোঝা সম্ভব হবে না। সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা না ক'রে আমি কয়েকটা নমুনা এখানে তুলে ধরছি, যার মধ্যে দিয়ে পাঠকের ধারণাটা স্পষ্ট হ'তে পারবে। যেমন—অবিকৃত > আবিষ্কৃত; কংসবধ > বংশধর; সদাজাগ্রত > সদাজন্তর; যুবকটা > খুব একটা; কেবলরূপক > করলা বাগান >কলাবাগান। অনুরক্ত > অনেক রক্ত; শ্লেষ > শ্রেষ্ঠ; সাধারণ ধর্ম > সমবায় ঋণ; নৈবেদ্যকাব্যের >নেইবাদ্য ব্যক্তির >নেইখাদ্য ব্যক্তির; বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন >বেদানা বা কলা না খাওয়া হলে; বিশ্ববরেণ্য কবি >বিশ্বকর্মা কবি; ভারতী পত্রিকা > ভারতীয় পত্রিকা; ফণীভূষণের জন্ম ফুলবেড়ে গ্রামে >ফণীমনসার জন্মস্থল বেড়ে গ্রামে >ফণী মনসার জন্ম স্থানে বোড় গ্রামে; বলাই > কসাই; চরণের অন্তে > রেলের প্রান্তে.... এরকম আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত পরীক্ষকদের নজরে আসতেই পারে।

আমি এবার বলতে চাইব, যারা অপরের খাতায় চোখ

বুলিয়ে এমন উদ্ভট শব্দ ও বাক্য পরীক্ষার খাতায় লেখে, তাদের কি পাশ করানো যায়? যারা সামান্য পড়াশোনাও করে না; পাঠ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে এতটুকু অভিজ্ঞতা বা ধ্যানধারণা লাভ করে না, তাদের পক্ষেই তো এমন উদ্ভট শব্দ বা বাক্য প্রয়োগ সম্ভব। তারা নিজেরাই অজান্তে নিজেদের গুণের পরিচয় পরীক্ষার খাতায় দিয়ে দেয়, তারা যে কিচ্ছু পড়াশোনা না-ক'রে, অসৎ উপায়ে অন্যদের খাতা থেকে উত্তর সংগ্রহের চেষ্টা করেছে, এটা বুঝতে আর অসুবিধা হয় না। যদি বোঝাই যায়, তাহলে পাশ করাবার ইচ্ছেটা আর থাকে না। তাছাড়া, ভুল ও উদ্ভট উত্তরে তো পরীক্ষকগণ নম্বর দিতে পারেন না!

ভুল উত্তর বা উদ্ভট উত্তর শুধু দেখে লেখার কারণেই হয় না; শুনে লেখা বা না-প'ড়ে, না-জেনে বানিয়ে লেখার ক্ষেত্রেও হ'তে পারে। যথার্থ উত্তরটা কেউ টুকলে তার অসততা ধরা যায় না; কিন্তু ভুল উত্তর বা উদ্ভট উত্তর টুকলে তার অসততা এবং নির্বুদ্ধিতা সহজেই ধরা যায়। পরীক্ষকগণ এই জন্য সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশ ছেলে-মেয়েদেরই পাশ নম্বর দিতে পারছেন না। পাশ কোর্সে একশো জন ভর্তি হ'লে এবং পরীক্ষায় বসলে দশ-বারোজন ভালোভাবে পাশ করে কিনা সন্দেহ আছে। তাই, 'পার্ট- ওয়ান' পরীক্ষায় একশোজন বসলেও 'পার্ট থ্রি' পরীক্ষা পর্যন্ত তিরিশ জন পরীক্ষার্থীও পৌঁছোচ্ছে না। একবার দু'বার পরীক্ষায় বসেই তারা বুঝতে পারছে, বি.এ., এম.এ. পরীক্ষা আগের পরীক্ষাগুলোর মতো নয়। এখানে মুখস্থ করে কিছু লিখতেই হয়। পাশের খাতা দেখে বা বাইরে থেকে আনা কাগজ দেখে কত আর লেখা যায়! একটা-দুটো প্রশ্নের উত্তর টোকা গেলেও সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তো এভাবে দেওয়া যায় না। তাই, পাশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এখনকার কিছু কিছু পরীক্ষার্থী শুধু পরীক্ষায় ফেলই করে না, মানুষের কাছে হাস্যাস্পদ করে তোলে নিজেদের। যে বিদ্যা চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীতেই আয়ত্ত করা উচিত ছিল, বি.এ. ক্লাসেও যে তারা সেই বিদ্যায় অজ্ঞ, তা' তারা নিজেরাই জানাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে যেন পরীক্ষায় বসে। পয়সা খরচ ক'রে স্কুল কলেজে ভর্তি হব, মাসে মাসে টিউশন ফি দেব, আরও কত ফি দিয়ে কলেজ থেকে কত কিছু পাওয়ার অধিকার অর্জন করব, অথচ, নেবার সময় কিছুই নেব না—এমনটা কি কখনো হয়? আজকের শিক্ষাজগতে সাধারণ মেধার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে এমনটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা কিছুই নিচ্ছে না। নেবার মানসিকতাটাই তাদের মধ্যে গ'ড়ে ওঠেনি। শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই তারা শিক্ষার বিপরীত দিকে মনোযোগী হওয়াটা অভ্যাস ক'রে নিয়েছে। বইয়ের থেকেও তারা বেশি ভালোবাসে মোবাইল ফোনটাকে। পড়ার থেকেও বেশি মনোযোগী হয় নেট-চাটিং-এ। তাতে যা শেখে, তা' তাদের পরীক্ষায় পাশ করতে বা ভালোমানুষ—বড়ো মানুষ, গুণী মানুষ হ'তে সাহায্য করে না। হাস্যাস্পদ ক'রে তোলে। চোখের সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড়ো অংশের এই পরিণতি দেখে কোনো শিক্ষক, কোনো অভিভাবক উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না। তাই, পরীক্ষার খাতায় উদ্ভট, হাস্যকর শব্দ প্রয়োগ দেখে আমরা হাসলেও, ভিতরে ভিতরে কষ্টবোধ করি। সেই জন্যই বিষয়টিকে 'হিউমার' বলতে চেয়েছি।

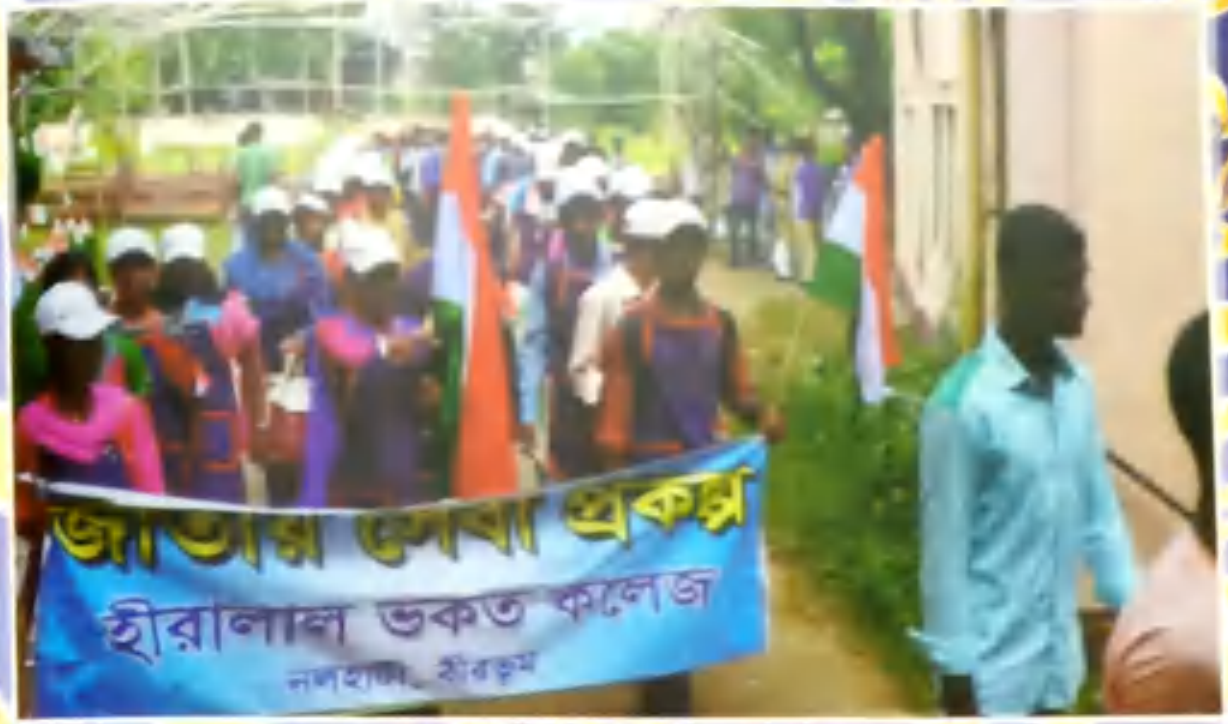

১৫ই আগষ্ট, স্বাধীনতা দিবসে এন.এস.এস. এর শোভাযাত্রা।

বাণিজ্য বিভাগের আলোচনা সভায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনে ছাত্রী পল্লবী মণ্ডল।

ফিজিক্যাল এডুকেশনের ক্লাস চলছে—প্র্যাকটিক্যাল।

ফিজিক্যাল এডুকেশনের ক্লাস চলছে, — মেয়েদের ব্যাডমিন্টন।

ন্যাক পিয়ার টিম-এর বিদায়ী সভায় বক্তব্য রাখছেন চেয়ার ম্যান পঙ্কজ কুমার চাণ্ডে।

এন.এস.এস-এর উদ্যোগে নারীসুরক্ষা বিষয়ে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ

এন.এস.এস.-এর নারী সুরক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভায় আগত অতিথিদের বরণ।

সুন্দর বনের লৌকিক মেলা

সুকুমার মণ্ডল

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

মানুষের কাছে সুন্দরবন আজও বিস্ময়ের জগৎ। সুন্দর বনের বিস্তৃতি ও তার আয়তন নিয়ে নানা অভিমত রয়েছে এই অঞ্চলের মানুষের কাছে। বাংলা বিভক্ত হবার পূর্বে সুন্দরবনের বন অঞ্চলের আয়তন ছিল ২০,০০০ বর্গ কিমি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৯৬৩০ বর্গ কিমি। এর মধ্যে সংরক্ষিত বন আছে ৪২৬৪ বর্গ কিমি! সুন্দরবন অঞ্চলের পূর্ব পশ্চিমে ১৪০ মাইল আর বঙ্গোপসাগর জুড়ে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত ৬০ থেকে ৮০ মাইল। কাজেই বিস্তীর্ন অঞ্চল নিয়ে এই সুন্দরবন অঞ্চল বিস্তৃত।

সুন্দরবন অঞ্চল নিয়ে মানুষের আগ্রহ বহু দিনের। বিশেষ ক'রে, এই অঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন সংস্কৃতি, তাদের আচার-ব্যবহার, তাদের জীবিকা সম্পর্কে। বিশেষ করে এই অঞ্চলের বিভিন্ন মেলা সম্পর্কে। সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকমের মেলা হয়। সেই সমস্ত মেলাগুলির সামান্য কিছু অংশ বর্ণনা করা হল ঃ-

সুন্দরবন অঞ্চলে বারোমাসে তের পার্বণ পালিত হয়। গ্রামদেবতার থানে— মেলা বসে বিভিন্ন প্রান্তে। এর মধ্যে রামরুদ্রপুরের বনবিবি মেলা বিখ্যাত। এই মেলা হয় জয়নগর থানায় রামচন্দ্র পুরের হরিণ খালির মাঠে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ এখানে সমবেত হয়। এছাড়া ১ মাঘ মাসে সারা রাত ধরে বনবিবির জাঁতাল পূজা উপলক্ষে গ্রাম ব্যাপীর মেলা বসে হলদিয়া গ্রামে। বিশালাক্ষী মেলা ফাল্গুন মাসে কুলতলী ফরেষ্ট অফিস চত্বরে। হাজার হাজার মানুষ এখানে সমবেত হয়।

আদিবাসী মেলা পৌষ মাসে সুন্দরবন অঞ্চলে গোসাবা থানায় আমতলী গ্রামে। হাজার হাজার মানুষ এখানে সমবেত হয় টুসুর মেলা উপলক্ষে। এখানে মোরগ খেলা হয়। হাজার হাজার মানুষ কয়েক ঘন্টার জন্য এই খেলা করে। ২০০২ সালে বনবিবি উৎসব শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরের তরফ থেকে গোসাবা থানার রাঙাবালিয়া গ্রামে। আবার ২০০৩ সালে বনবিবি মেলা বসেছিল কইখালি দ্বীপের শ্রীরামপুর কৃষ্ণ আশ্রমে। এই মেলা বিশ্বায়নের যুগে গ্রামকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে।

মানুষ তার আরণ্যক জীবনে অন্য জীবে মত নিজের অস্তিত্ব বাজায় রাখার স্বার্থে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে সেই সুদূর প্রাচীন কাল থেকে। প্রকৃতির নিষ্ঠুর করালরোষ এই অঞ্চলের জীবন যাত্রায় ফেলেছে গভীর প্রভাব। সেই প্রাচীন কালের জন্তু জানোয়ারের ভয়, প্লাবন, ঝঞ্ঝা, খাদ্য সংগ্রহে বাধা ইত্যাদি প্রলয়ের আশঙ্কা, মহামারী, যেমনভাবে মানুষকে আহত করেছে তেমনিভাবে বিবর্তনের পথ ধরে সমাজ, সভ্যতা, জীবন ও জীবিকা' আচার, অনুষ্ঠান, দেবদেবীর কল্পনা, পূজাপার্বন, উৎসব মেলা—সব কিছুরই মধ্যে মানুষ ঘরে ফিরে এসেছে ঐশ্বরিক চিন্তা ও প্রকৃতি-বন্দনা নিয়ে। তাই সুন্দরবন অঞ্চলের এমন কিছু দেব দেবী পূজিত হয় যা ভূভারতে পূজিত হবার সন্ধান একেবারেই কম। শিব, দূর্গা, কালী, শীতলা, মনসা এখানে পূজিতা হন। আবার রক্তমা, বড়খাঁ গাজি, গাজি বাবা, বনবিবি, জ্বরাসুর, দক্ষিনরায়, ওলাবিবি ধর্মঠাকুর, চন্ডী, বারাঠাকুর এখানে পূজিত হন। হিন্দুদের মন্দির আছে যেমন; তেমনি মুসলিমদেরও মসজিদও আছে। কিন্তু হিন্দু মুসলমানদের বিরোধের চিহ্নমাত্র নেই এখানে। তাই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে। এই অঞ্চলে মনসাদেবী স্বমহিমায় পূজিতা হন, তার একমাত্র কারণ দেবী মনসার মহিমাকীর্তি ধরে ভাসান গান আজও ঐ অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। এই ভাসান গানের মধ্যে লোকিক উপাদনের সংমিশ্রনে পরিণত হয়েছে লোকসাহিত্য। সুন্দরবন অঞ্চলে ভাসান গানে বহু কাল্পনিক ঘটনার সংমিশ্রনে এক নতুন রূপ পেয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান। বিভিন্ন স্থানে আজও বিভিন্ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গোসাবার বিজয় নগরের বাসন্তী মেলা কয়েক বৎসর অতিক্রম করল। হাসনাবাদ জেলার রামেশ্বর পুর গ্রামে ৭০-৭৫ বছরের পুরানো মেলা; প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উপলক্ষে শুরু হয়। ক্যানিং টাংরাখালী, কালীবাড়ির সামন্তদের পুজো ১৫৭ তম বর্ষে পদার্পন করেছে। চাঁড়াল খালির হরি মেলা মাঘমাসের পূর্ণিমাতে শুরু হয়। ২০-৩০ হাজার মানুষ এখানে সমবেত হয়। এই মেলাটি হয় বাংলাদেশ সীমান্তে। রামেশ্বরপুর গ্রামের হাসনাবাদ ব্লকে রাধাকৃষ্ণের মেলা; ৭০-৭৫ বছর পুরানো এই মেলা। হিঙ্গলগঞ্জ থানার সাহেবখালি ও গৌড়েশ্বর নদীর মিলন স্থলে হাটগাছা গ্রামে। ফাল্গুন মেলা হয় প্রতি বৎসর ৪০-৪৫ বছরের পুরানো এই মেলা। আরো একটি বড় মেলা হয় মন্দির বাজার কেশবেশ্বর শিবমন্দির তলায়, চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজন মেলা আড়াইশ বছরেরও পুরানো। মেয়েরা শিবের মাতায় জল ঢালে। কুলতলি গ্রামে বাসন্তী ব্লকে রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসব হয়। ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমা থেকে ৪ দিনের মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে বাঁকরা গ্রামে ২০০ বছরের পুরানো একটি মেলা হয়—বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষ পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়ি চেপে দেখতে আসে এই মেলা। জয়নগরে (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) ২৪ চৈত্র-১লা বৈশাখ পর্যন্ত ৪ দিন ধরে শিবের গাজন মেলা আয়োজন হয়। ক্যানিং রায়বাঘিনী গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তি তিথি থেকে ১লা বৈশাখ গোষ্ঠ মেলা। এই মেলাটির বয়েস ৭৫ বছরেরও বেশি।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা মসজিদ বাটিতে ২৪শে চৈত্র থেকে তিনদিন মেলা হয়, মেলাটি কাছারির মেলা নামে পরিচিত। একটি শ্মশানকে কেন্দ্র করে মেলাটি গড়ে উঠেছে। শোনা যায় শ্মশানের দুই পাশে দুটি গাছ ছিল, তেতুঁল গাছ ও কুলগাছ। দুপুর বেলা শ্মশানের পাশ দিয়ে যাওয়া যেত না, এখানে এক গর্তে হাত দিলে একটি মাদুলি পাওয়া যেত, তাতে প্রচুর মানুষের রোগ সারত। আজও সেই মেলাটি হয়। গোসাবার কুচিকালি গ্রামে মনসা মেলা হয় ৭ দিন ব্যাপী, মনসাদেবীর প্রতিমা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, ভাদ্র মাসে এই মেলা থাকে। কালিন্দী নদীর পশ্চিমতীরে ভগবান মৃধা নামে এক ব্যক্তি এখানে বসতি স্থাপন করেন, কথিত আছে শ্রী হরিকে তাচ্ছিল্য করার অপরাধে ভগবান মৃধার বাড়ির সকলেই কলেরায় আক্রান্ত হন। তখন ভগবান মৃধা শ্রী হরিকে স্মরণ করেন। শ্রী হরি স্বপ্নে আদেশ দেন আমার পূজা করলে সকলেই তোরা ভালো হয়ে যাবি, সেই উপলক্ষে আজও সেই মেলাটি হয়। এত বেশী মানুষের সমাগম আজও সুন্দরবন অঞ্চলে আর কোথাও দেখা যায় না। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু হরিকীর্তনের দল ও সাধারণ মানুষ এই মেলায় উপস্থিত হয়।

ক্যানিংয়ে ঘুটিয়ারি শরিফের হজরত পীর মোবারক আলি গাজী সাহেবের স্মৃতি উপলক্ষে ১৭ই শ্রাবণ উরুস উৎসব শুরু। একদিনের মেলায় লক্ষাধিক মানুষ সমবেত হয়। শোনা যায় এক সময় এখানে বৃষ্টির অভাবে পুকুর সব শুকিয়ে যায়। পানীয় জলের হাহাকার। গাজীবাবা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। তিনি শয়নে মৃত প্রায় অবস্থায় এই কঠিন প্রার্থনায় বসেন। তিনদিন তিনরাত কঠিন প্রার্থনায় অতিবাহিত হওয়ার পর বহিরাগত ভক্তরা তাঁহাকে স্পর্শ করায় তিনি প্রাণ হারান। শোনা যায় সেইদিন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছিল। সেই উপলক্ষে তাঁকে অনুসরণ করে আজও মেলা হয়।

সুন্দরবনে বনবিবির মেলাও বসে। কথিত আছে, মা বনবিবি সর্বজয়ী কর্ত্রী। সবাইকে রক্ষা করেন। তিনি বিপদ তারিণী, তাঁর পূজা উপলক্ষে সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে থান আছে মাটির তৈরী। কথিত আছে এক বিধবার সন্তান 'দুঃখ'। ধোনাই নামে এক ধনী মৌলে দুঃখকে বনে নিয়ে যান। নৌকায় করে মধু সংগ্রহের উপলক্ষে। কিন্তু কোথাও মধু না পেয়ে দক্ষিণরায় নামে এক দেবতার পুজো করো সেই দেবতা ধোনাইকে স্বপ্ন আদেশ দেন যে দুঃখকে আমাকে দিলে তোকে আমি অনেক মোম ও মধু দেব। ধোনাই সেই কথা মত দুঃখকে বনে রেখে আসে। দক্ষিনরায় ভয়ঙ্কর বাঘ হয়ে দুঃখকে খেতে আসে। তখন দুঃখের মায়ের কথা মনে পড়ল। তার মা তাকে বলে দিয়েছিল বনে গিয়ে বিপদে পড়লে মা বনবিবির কথা স্মরণ করবি, মা তোকে উদ্ধার করবে। মা বনবিবি তখন দুঃখকে রক্ষা করেন এবং কোলে তুলে নেন। মা দুঃখকে বহু ধন রত্ন দেন। দুঃখ দেশে এসে রাজা হন, এবং সে মাকে পুজা করে। সেই থেকে আজও মা বনবিবি

সবার কাছে পূজা পান। মা বন বিবি বলেন, "আমি ১৮ ভাটির মাঝে সকলের মা। আমাকে মা বলে ডাকলে আমি সকলের উদ্ধার করবো।"

আর একটি মেলা হয় কপিলমুনির আশ্রমকে কেন্দ্র করে। কয়েক লক্ষ মানুষ এই সাগর মেলায় স্নান করে। দু-হাজার বছর আগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সমাদৃত এই মেলাকে জাতীয় মেলা হিসাবে তুলে ধরলে আমাদের হয়ত ভুল হবে না।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী ঃ-

১) শ্রী খন্ড- দেবপ্রসাদ জানা

২) ২৪ পরগণা ঃ উত্তর ও দক্ষিণ - কমল চৌধুরী।

কলেজের এন.এস.এস বিভাগ কর্তৃক জঙ্গল পরিস্কারকরণ

মেঘদূত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

প্রীতম রুজ
অতিথি অধ্যাপক, সংস্কৃত

ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন কবি প্রতিভার প্রাতিস্বিকতা এবং কবিকর্মের স্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন-

সংবাদাস্তু ভবন্ত্যেব বাহুল্যেন সুমেধসাম্।
নৈকরূপতয়া সর্বে তে মন্তব্যাবিপশ্চিতা।।[১]

অর্থাৎ সুকবিদের রচনার মধ্যেও বহুল পরিমাণেই পরস্পর সংবাদ বা সাদৃশ্য থাকতেই পারে, কিন্তু সেই কারণেই তাঁদের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য বা অনন্যতা এবং তাঁদের বাক্‌নির্মিতির অভিনবত্ব ও কাব্যত্ব কখনও বাহত হতে পারে না। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যপাঠের ইঙ্গিতবহ ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের যে কৃতিত্ব তা প্রসঙ্গত স্মরণীয় বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত' কাব্যের ভাব অবলম্বনে বিভিন্ন সময় কখনো কাব্যের আকারে কখনো বা প্রবন্ধের আকারে প্রাতিস্বিক ভাবনা ব্যক্ত করেছেন- যেগুলিকে আনন্দবর্ধনের ভাষায় বলা যেতে পারে 'তুল্যদেহিতুল্য' কাব্য-সংবাদ। অর্থাৎ দুই ভিন্নকালের হলেও এই রসসমর্পিত কাব্য-সংবাদের স্বতন্ত্র আস্বাদ রয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিপত্রেও 'মেঘদূত' সম্পর্কে একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন— যেগুলিও সাহিত্যপদবাচ্য হতে পারে। বিষয়টিকে রবীন্দ্রবচিত চিঠিপত্রগুলি উৎকলনপূর্বক আলোচনা করতে পারি।

১৮৯০ সালে কোনো একদিন (তারিখহীন) রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন—

'মেঘদূত পড়ে কি মনে হচ্ছিল জান? বইটা বিরহীদের জন্যেই লেখা বটে-কিন্তু এর মধ্যে আসলে বিরহের বিলাপ খুব অল্পই আছে-অথচ সমস্ত ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে বিরহের আকাঙ্খায় পরিপূর্ণ।'[২]

উক্তিটি ব্যক্তিগত ভাবনাসিক্তিত হলেও সাহিত্য-তত্ত্বের খুব মৌলিক জায়গাকে ধরে নাড়া দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। একথা বলাই বাহুল্য, 'মেঘদূত বিরহীর গভীর মর্মগ্রাহী অভিব্যক্তি নিয়ে লিখিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এখানে 'বিরহের বিলাপ' এর বাড়াবাড়ি নেই। বাস্তবিক 'মেঘদূত' চিৎকৃত আর্তনাদ নয়। বিরহের মাত্রাকে যথাথ প্রকৃতি দৃশ্যের বর্ণন-সমতায় বিরহী যেন এখানে খানকটা নিজের দুঃখের প্রশমন ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এরপর দুটি কথা বলেছেন—

ক. ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে বিরহীর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ।

খ. মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দীহৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে প্রসঙ্গ দুটি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু আসলে তা নয়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে 'মেঘদূত' এর ত্রয়োদশ সংখ্যক শ্লোক এর কথা, যেখানে যক্ষ বলেছে—

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ! শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।'[৩]

অর্থাৎ 'হে মেঘ! তুমি প্রথমে আমার কাছে তোমার যাত্রার অনুকূল পথের বিবরণ শ্রবণ করো। পরে আমার শ্রোত্ররসায়ন বার্তা শুনিও।'

তাহলে 'মেঘদূত'-এর দুটি প্রধান বিষয়বস্তু-এক, অলকাগামী মার্গবর্ণনা। দুই. বিরহিণী যক্ষাঙ্গীর উদ্দেশে যক্ষের বার্তা। কিন্তু অলকা মার্গের বর্ণনাই কাব্যটিতে বেশি। তাই কাব্যটির 'পূর্বমেঘ' ও 'উত্তর মেঘ'- যা মল্লিনাথ উপরোক্ত বিষয় অনুযায়ী বিভাগ করেছিলেন, তা খুব যুক্তিসংগত নয়। কারণ, 'উত্তরমেঘ'-এ অলকাপুরী, যক্ষের বাসভবন, ও যক্ষপত্নীর বর্ণনা রয়েছে। স্বভাবতই 'মেঘদূত' রবীন্দ্রকথিত "বন্দীহৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ"। তাহলে বিরহীর বিরহ কি এখানে উপলক্ষ্য মাত্র? আসলে তা নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

নিরুদ্দেশা ভ্রমণ নয়- সমস্ত ভ্রমণের শেষে বহুদূরে একটি আকাঙ্ক্ষার ধন আছে-সেইখানে চরম বিশ্রাম.....[৪]

বলা বাহুল্য এই আকাঙ্ক্ষার ধনের জন্যেই বিশ্বভ্রমণের

তাগিদ। কিন্তু শুধুই বিশ্বভ্রমণের তাগিদ নয়, কালিদাস পথ বর্ণনার পরতে পরতে যক্ষের যে সহমর্মি হৃদয়কে ফুটিয়ে তুলেছেন তা তার অন্তঃস্থিত ভালোবাসারই অভিব্যক্তি। যেমন একটি শ্লোকে যক্ষ মেঘকে বলছে- ' সকালে প্রণয়িগণ খন্ডিতা রমণীদের নয়নসলিল শান্ত করবে, অতএব তুমি সূর্যের পথ শীঘ্র ত্যাগ করবে। সূর্যও নলিনীর কমলবদন হতে হিমরূপ অশ্রু দূর করতে আসবেন, তুমি পথরোধ করলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হবেন'।

এদিক থেকে 'মেঘদূত' রবীন্দ্রকথিত' ভিতরে ভিতরে বিরহীর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ।' উল্লেখ্য যে 'মেঘদূত' প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা উক্ত চিঠিটি সব থেকে দীর্ঘ। এছাড়া এই সময়েই ইন্দিরা দেবীকে লেখা "ছিন্নপত্রাবলী"-র একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত' প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন কালিদাসের 'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ শব্দান্' শ্লোকটি উদ্ধার করে বলেছেন-

মেঘ দেখলে সুখী লোকেরাও কেমন আনমনা হয়ে যায়। সৌন্দর্য যে মনের মধ্যে একটা নিগূঢ় রহস্যময় অসীম আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, যা মনকে জন্ম থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, কালিদাসের কবিতার মধ্যে এই ভাবটা পড়ে আমার ভারী আনন্দ হল।'.....[২]

বর্ষা যে রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরহের ভাব বহন করে তার উল্লেখ একাধিক জায়গায় আছে। আমাদের মনে পড়বে "জীবনস্মৃতি"-র 'বর্ষা ও শরৎ' প্রবন্ধের কথা, যেখানে তিনি লিখেছেন—

'সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে, সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা-বাদ্য লইয়া মহা সমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে।'[৩]

তাই বলা যেতে পারে কালিদাসের 'মেঘদূত' রবীন্দ্রনাথের কাছে কখনো অবলম্বন ও উদ্দীপন হয়ে উঠেছে। "ছিন্নপত্রাবলী"-র আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখছেন—

'মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে - নিদেন আমার পক্ষে।..... হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং প্রকৃতির সেই রাজসভায় বসে অমর ছন্দে মানবের বিরহসংগীত গেয়েছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদায় হয়- সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু-বহু-কালের শত শত সুখ দুঃখ বিরহ মিলনময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবস।'[৪]

আবার রবীন্দ্রমননে 'মেঘদূত' এর প্রভাব যে কত গভীর, সময়ে সময়ে তাঁর চাক্ষুষ প্রকৃতির বর্ণনাতেও ধরা পড়েছে—, যেমন—

'সকালবেলাকার পরিত্যক্ত বিছানার মতো-নদীর স্রোত যেখানে পাশ ফিরেছিল, যেখানে যেমন ভার দিয়েছিল, তার বালুশয্যায় সেখানে তেমনি উঁচুনিচু হয়ে আছে- সেই বিশৃঙ্খল শয়ন্ত কেউ আর যত্ন করে হাত দিয়ে সমান করে বিছিয়ে রাখে নি, সমস্ত এলোমেলো বন্ধুর হয়ে এই বিস্তীর্ণ বালির ওপারে একটি প্রান্তে একটুখানি শীর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহিনীর বর্ণনায় আছে যে যক্ষপত্নী বিরহশয়নের একটি প্রান্তে লীন হয়ে আছে, যেন পূর্বদিকের শেষ সীমায় কৃষ্ণপক্ষের কৃশতম চাঁদটুকুর মতো। বর্ষাশেষের এই নদীটুকু দেখে বিরহিণীর আর একটি উপমা যেন দেখা যায়।'[৫]

কখনো আবার রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ঘটনাকে ব্যক্ত করতে 'মেঘদূত' এর চিত্রকল্পকে উল্লেখ করেছেন। যেমন হেমন্তবালা দেবীকে লিখছেন—

'যিনি প্রমাদ ঘটিয়েছেন তিনি এই আশু অপরাধের পূর্ব্বেই কিছুকাল থেকেই কান্তাবিরহগুরুণা শাপেনাস্তংগমিতমহিমা।'[৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কখনো ব্যক্তিজীবনের ঘটনা প্রসঙ্গে, কখনো বা সরাসরি রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিভিন্ন সময়ে 'মেঘদূত' এর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যভাবনায় কালিদাস-এর এই কাব্যটির প্রভাব

য়ে অনেক সমালোচক আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি ার চিঠিপত্রের 'মেঘদূত' সংক্রান্ত এই ব্যাখ্যা শ্লেষণগুলিও উল্লেখযোগ্য - যেগুলি শুধু আপন হৃদয়ের াবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ নয়, একদিকে এগুলি যেমন কালিদাসের াব্যভাবনাকে নতুনভাবে আস্বাদন করার উপাদান, তেমনি বীন্দ্রমনন ও চিন্তনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করারও াকরস্বরূপ।

উল্লেখপঞ্জি

১. ধ্বন্যালোক, ৪.১১
২. চিঠিপত্র ৫, পৃ. ১৩৯-১৪০
৩. রাজশেখর বসু সম্পাদিত কালিদাসের মেঘদূত, এম. সি. সরকার, ১৪১১ পৃ. ১১
৪. চিঠিপত্র ৫, পৃ. ১৪০
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্রাবলী, ৪০ নং পত্র রবীন্দ্র রচনাবলী একাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৫০-৫১
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী দশম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ১১১
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্রাবলী, ৫৫ নং পত্র রবীন্দ্র রচনাবলী একাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৬৪-৬৫
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্রাবলী, ৮১ নং পত্র রবীন্দ্র রচনাবলী একাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৯০
৯. চিঠিপত্র ১১, পৃ. ৩১

অন্য মানব জীবন

শ্রী বিমল পাল
সহযোগী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ

আমাদের এই পৃথিবী সর্বত্র প্রকৃতি জুড়ে কী এক মায়াময় জগৎ তৈরি করেছে তার বৈচিত্র্যময় রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদি যেন সাজিয়ে দিয়েছে। মনে হয় এই প্রাকৃতিক জগৎ প্রত্যেকটি মানব মনের অন্তরে নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছে জানতে যে, মানবগণ তোমরা কি উপলব্ধি করতে পারছ আমার এই সুন্দর সৃষ্টির উপাদান- সমুদ্র, নদী, পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, বিশুদ্ধ বাতাস, রবি ও শশীর রূপ মাধুর্য। এই ভাবেই কি ভালবাসতে পারছ সমগ্র মানব সমাজকে- যে মানব সমাজ সৃষ্টি ও প্রকৃতির একটি মহামূল্যবান দান। মানব প্রেমী, হিসাবে আমাদের ভোগ, ভালবাসা, আনন্দ, দুঃখ বেদনা সকলের মধ্যে সমান করে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতে পারলেই জীবন কত সুন্দর, কত আবেগময় হতে পারে।

কিন্তু বাস্তবে চোখ ও মন একটু খোলা রাখলেই বোঝা যায় যে, আমরা বোধহয় প্রকৃত মানব প্রেমিক হয়ে উঠতে পারিনি কিংবা চাইনি। বহু শতাব্দী পার করে দেবার পরও মানব মনের আলো, অন্ধকার, দেহ গঠনের মায়াবী বিভিন্নতার মাঝেও আমরা কিন্তু আচ্ছন্ন হয়ে আছি এমন এক শিক্ষায় যে শিক্ষা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তি আলোচনা, এমন কি, মনের ভাবনাকেও একমুখী করে রাখে। কিছুটা বুঝতে পারলেও সেগুলিকে নিয়ে আলোচনা, বিশ্লেষণ করা, যুক্তিবাদী মন দিয়েও যা সত্য তা স্বীকার করিনা অথবা যা মিথ্যে তাকেও সত্যের আলোকে আনতে চাই না। যে শিক্ষা আমরা শৈশব থেকেই লালিত করি, বা পরিজনেরা করে এসেছেন এবং সেই শিক্ষায় আমরা মূলতঃ আবদ্ধ থাকি। ছোটবেলা থেকেই আমরা মানব জীবন সম্পর্কে যা জেনে এসেছি, তার বাইরে যে অন্য কোন মানব জীবন থাকতে পারে এ সম্পর্কে সঠিক দিশা আমরা গুরুজনদের থেকে পাইনি, কিছু বিষয় তারা অজান্তেই কিংবা জেনে বুঝেও আমাদের মানব জীবনের আলো-আঁধারি বিষয়গুলোকে তারা আলোকিত করেন না। প্রথমতঃ 'মানুষ' সম্পর্কে সেই প্রথাগত চিরাচরিত রূপকেই বোঝানো হয়। অর্থাৎ পুরুষ এবং নারী রূপেই আমরা লিঙ্গ ভেদ করি, মানব রূপে নয়। এ যেন দাগিয়ে দেওয়া বিষয় যা হল তুমি হতে পার পুরুষ অথবা স্ত্রী। এর বাইরে রাষ্ট্র বা সমাজ কিছু ভাবতে পারে না। তাহলে মানব রূপে কি অন্য কোন লিঙ্গ আছে? অবশ্যই ছিল আছে এবং থাকবে। তাহলে কেন মানব এই দুটি খোপের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে? যা সত্য বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমানিত তা যতই আমরা উন্মোচন বিরোধী হই না কেন, একদিন তা অবশ্যই প্রকাশ্যে আসবে।

আমাদের ভারতবর্ষে রাষ্ট্র চিন্তা এবং সামাজিক চিন্তাকে একাকার করে দেওয়া হয়েছে। অথচ বিশ্বইতিহাস, বিশ্ব সাহিত্যকে অতি প্রাচীন কাল থেকে যদি দেখি তাহলে অনেক চরিত্র'র কথা আমরা বুঝতে পারি, এরাও মানুষ বা মানব। আমাদের অর্থাৎ রাষ্ট্র বা সমাজ এটা নিয়ে আদতে ভাবিত নয়, তাদেরকে অপাংক্তেয় করে রাখা হয়, তাদেরকে স্বীকার করে নেওয়ার অভ্যাসই তৈরি করে দেওয়া হয় না। এই ধরনের মানব কূলকে চিরকালই "অবমানব" করে রাখার পিছনে কিন্তু অদ্ভুত যুক্তি কৌশল খাড়া করে দেওয়া হয়। শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ণ, মেধাবৃত্তির উন্মেষ এবং বিজ্ঞান চেতনা ঊর্দ্ধমুখী হওয়ার জন্য আজকের পৃথিবীর মানব শাখার বিভিন্ন পর্যায়গুলি আমাদের দৃষ্টিগোচরে এসে গেছে এবং রাষ্ট্র বা সমাজ আজ পর্যন্ত কিছুটা স্বীকার করে নিয়েছে এবং সেই জন্যই আজ "তৃতীয় লিঙ্গ" বা Third Gender নামে একটি আলাদা খোপ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এটাই সব নয়, মানব মনে আলো আঁধারের মধ্যেই আরো অনেক শ্রেণী বিন্যাস আছে। তা আমরা আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারি না। সেই জন্যই তো এখন লিঙ্গ বিন্যাসের ক্ষেত্রে "তৃতীয় লিঙ্গ" না বলে "Others" বা অন্যান্যর জন্য খোপ রচিত হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক

মহল, বিজ্ঞান মহল এবং বিশ্বব্যাপি "অন্যান্য" মানব কূলের যার পর নাই আন্দোলনের ফলে রাষ্ট্র কিছুটা ধ্যানধারণা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তা বলে সবটাকেও এখনো পর্যন্ত আইনত মেনে নেয় নি।

তৃতীয় লিঙ্গের মধ্যে অবস্থান করে কারা তা আমরা জানি, অর্থাৎ এমন মানব আমরা দেখতে পাই যেখানে একাধারে পুরুষ বৈশিষ্ট্য আছে সংগে নারী বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। সোজা কথায় যাদের আমরা উভয় লিঙ্গ এবং অবমানবে পরিণত করি 'হিজড়ে' বা 'হিজড়া' এই নাম দিয়ে। আমরা সবাই কমবেশী এই সম্প্রদায়ের মানবগুলির সাথে পরিচিত। সংখ্যায় কম হলেও তাদের আমরা দেখি হিনম্মন্যতার দৃষ্টি দিয়ে, কারণ তাদের আচার-আচরণ জীবনযাপন কলা সম্পূর্ণ অন্য। একে সংখ্যায় কম, তার উপর গরিষ্ঠ মানবকূলের তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গি অচ্ছুৎত করে রেখেছে আমাদের মূল সমাজ, এবং এই সমাজে তাদের জায়গা নেই। কিন্তু একটুকুও কি ভেবে দেখি যে এই হিজড়ে সম্প্রদায়ের জন্ম তো স্বাভাবিক দম্পতির থেকেই। অথাৎ, আমাদের মত তাদেরও তো মা-বাবা আছে। জন্মের পিছনে তো তাঁদের হাত নেই, প্রকৃতির হাত ধরেই তাঁরা এই পৃথিবীতে এসেছে। তাদের আচরণ, চালচলন, কথাবার্তা, বেশভুষা সব কিছুই খুব উগ্র যা আমাদের প্রায়শঃই দৃষ্টিকটু লাগে। কিন্তু আমরা কি আমাদের মধ্যে প্রশ্ন করি, তারা এমন করেন কেন এবং যাপন কলাও বৈচিত্রময় হওয়ায় আমাদের মনের মধ্যে কিছুতেই ঠাঁই দিই না। উদার এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে কারণগুলি আমরা সহজেই বুঝতে পারবো।

প্রথমত, যুগ যুগ ধরে অপমানিত শোষিত এই "প্রান্তিক" মানবদলকে তাদের মন, দুঃখ, বেদনা এবং কোন কিছু না পাওয়ার যন্ত্রণা তাদের জীবনকে মূল স্রোতের মানব কূলের সংগে মেলাতে পারে না। তাই এই বিষময় জীবনে কিছুইতো পাওয়া হল না, অভিশপ্ত জীবনকে তাই খানিক খুশির মেজাজ বা "মস্তি" করাতেই আপন করে নেয়। অথচ তাদের বাসস্থান বা যেগুলিকে আমরা "খোল" বলে জানি, সেখানেও জীবনযাত্রার নানা নিয়ম কানুন, নানা ধরনের Rituals এর অর্ন্তগত দেবীর পূজা হয়। আবার একথাও ঠিক ভারতবর্ষে সমস্ত রাজ্যেই এই প্রান্তিক মানবদের জীবনযাপন—কলাও এক নয়। এঁরা বেশীর ভাগই নিজেকে নারী বলে মনে করে, কিন্তু বাস্তবে তো তারা নারী নয় অথচ তাঁদের মৌন আকাঙ্ক্ষা থাকার জন্য যাপন কলাতেও বিভিন্নতা দেখা যায়। অবাক হতে হয় মৃত্যুর পর শেষ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে। হিজড়ে সম্প্রদায়ের মানবদের করব দেওয়া হয়, কবর দেওয়ার আগে, অর্থাৎ, মাটি ফেলার আগে তাদের সঙ্গী-সাথীরা অত্যন্ত অমানবিক ভাবে সেই মৃত মানবটিকে লাথি, কিল, ঘুষি, পাথর ছুড়ে মারা ইত্যাদি কর্মকার্য সমাধা করে বাড়ী ফেরে। প্রশ্ন অবশ্যই আমাদের মনে জাগবে এতটা হৃদয়হীন হন কেন তারা।

মূল কথা হল, "হিজড়ে" জীবন জন্ম থেকেই বিষময়, এই জীবনের সার্থকতা কিছুতেই তারা মেনে নেন না, তাই মৃত্যুর পর এমন মার মারা হয় যেন ব্যর্থ জীবনের প্রতি ক্ষোভ এবং সংগে তারা এই প্রার্থনাও করে যেন আগামী জন্মে পরিপূর্ণ নারী হয়ে এই মধুময় পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়।

ট্রান্স মানেই কি হিজড়া? না, ট্রান্স মানেই হিজড়া নয়। হিজড়া একটা প্রথা, একটা সংস্কৃতি, এক ধরনের পেশা বা জীবন চর্যা। হিজড়া প্রথা যাঁরা মেনে চলেন বা যাঁরা এই পেশা গ্রহণ করেছেন তাঁদেরই হিজড়া বলা হয়। হিজড়ারা ট্রান্সজেন্ডার (রূপান্তরকামী) হতে পারেন, ইন্টার সেক্স (মেয়ে ও পুরুষ উভয়ের চিহ্ন) হতে পারেন, 'মেয়েলি পুরুষ হতে পারেন, নারী হতে পারেন বা পুরুষও হতে পারেন। হিজড়া সমাজে পুরুষ-এর সংখ্যা আধিক, নারীরা খুব কম সংখ্যায় এই পেশা বা প্রথার সংগে যুক্ত, কিন্তু একেবারে নেই তা নয়। হিজড়াদের এক একটি অঞ্চলে আলাদা আলাদা দল হিসাবে 'শোল' থাকে। খোলের একজন নেতা বা 'গুরুমা' থাকেন, বাকিরা তাঁর চেলা/চেলী হিসাবে থাকেন। এটা একটা যৌথ জীবন সেখানে গুরুমার নিয়মে জীবন চলে।

"Transgender" শব্দটির বাংলা হল রূপান্তরকামী অর্থাৎ যে পুরুষ নারী হতে চায় কিংবা যে নারী পুরুষের রূপান্তর হতে চায়। "Trans Sexual" এর বাংলা হল রূপান্তরিত। অর্থাৎ যিনি রূপান্তরটা ঘটিয়ে ফেলেছেন অর্থাৎ শারীরিকভাবে নারী থেকে পুরুষ বা পুরুষ থেকে

নারী হয়ে গেছেন। "Cross Gender" মানে হল বিররীত সজ্জাকামী। সহজে বলতে গেলে বিপরীত সজ্জাকামী হল যিনি নারী হয়ে পুরুষের পোশাক পরেন বা পুরুষ হয়ে নারীর পোশাক পরেন। তথাকথিত মানব রূপ ছাড়াও আমরা কিন্তু মানব রূপের বিভিন্ন জটিলতার কথা বুঝতে পারছি। উপায় কী? সত্যকে সত্য বলে মেনে নিতে কারুরই কুণ্ঠা বোধ করা উচিৎ নয়। সমাজের মধ্যে আমরা প্রায়শঃই মদ্দা নারী অর্থাৎ নারী কিন্তু তার হাব ভাব, চাল চলনে এবং কথাবর্তায় একটু পুরুষালী রূপ দেখতে পাই। সেই রকম ভাবেই আমরা মেয়েলী পুরুষও দেখতে পাই, যেখানে পুরুষ হয়েও তার চাল চলন, কথাবার্তা, হাবভাব নারী সুলভ হয়ে থাকে।

একটা প্রসঙ্গ আসতে পারে, সেটা হল দেহ বড় নাকি মন বড়? এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম, তার নির্যাস হল তাই। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম মতামত থাকলেও একটু বৈজ্ঞানিক এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারব যে দেহটা তো খোলশ রূপ সেটাকে আমরা কেউই নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনা কিন্তু মন তো আমার নিজস্ব তাঁকে আমারা ইচ্ছামত চালনাও করতে পারি। মনের অধিকার কি কেউ খর্ব করতে পারে? এ প্রসঙ্গে মানবিধিকার বিষয়টি এসে যাবে। মানবাধিকার (Human Rights) কী? সোজা কথায় কারোর কোন রকম ক্ষতি না করে জীবন যাপনের ইচ্ছাকেই তো আমরা মানবাধিকার বলি। তাহলে ওই সমস্ত আলো-আঁধারি মানব মন গুলো কী তারা ইচ্ছা মত যৌন আনন্দ পেতে পারে না? রাষ্ট্র আরোপিত ৩৭০ ধারা এখনো পর্যন্ত তুলেদেয় নি বরং কিছুটা Rigid থেকে Fiexible হয়েছে। আইনের ধারা রাষ্ট্র শক্তি নানারকম হেনস্তা, নিপীড়ন, অত্যাচার চালায়। আমরাই তো রাষ্ট্রশক্তি, আমরাই তো মানব কিন্তু মানব হয়ে আমরা অপর মানব কূলকে অবমানবে পরিণত করছি। সেই ছোট বেলা থেকে আজ পর্যন্ত জীবন পথের প্রান্তরে অনেক ছোট ছোট, তুচ্ছ আবার একই সঙ্গে বড় মাপের মানব সন্ধান আমি বা আমরা পেয়েছি। কিছু কিছু মানব খোঁকা না খুঁকি হারিয়ে গেছে আবার অন্যদিকে জেদী শিক্ষিত মানব পেয়েছি, যাঁরা নিজেদের প্রচেষ্টায়, অশুভ ভ্রকুটিকে উপেক্ষা করে তারা যা হতে চান বা মন যা চেয়েছে, তাই করেছেন। তারই কিছু ঝলক আমরা দেখে নিতে পারি।

১) দেবু ঃ আমার ছোটবেলার খেলার সংগী, সারা দিন হাফপ্যান্ট প'রে গুলি খেলে গেছে। ডান্ডাগুলি, চুকিত্ কিত্ সব কিছুতেই তার উৎসাহ ছিল অসীম। আমরা একটু করে বড় হচ্ছি দেবুও বড় হচ্ছে। ফাইভ-সিক্স ক্লাসে পড়ার সময় মনে হল দেবু যেন একটু একটু করে পরিবর্তিত হচ্ছে। ওই বয়সেই পানখাওযা শুরু করেছে, মুখের মধ্যে কেমন যেন একটা পরিবর্তন আসছে। সব বুঝছি, কিন্তু বলার তো কিছু নেই। হঠাৎ একদিন শুনলাম দেবু বাড়ীতে নেই, ওর মা ছিল সরকারী হাসপাতালের নার্স। সবাইকেই জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ও বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু কেন? এই কেনর উত্তর অনেক দিন পর উপলব্ধি করলাম। সে বুঝতে পেরেছিল এই সমাজে তার স্থান নেই। থাকলেই নানা ধরনের প্রশ্ন, পরিবারে অশান্তি। তাই তো সবাইকে ফেলে নয় বরং সকলকে বাঁচাতে স্বেচ্ছায় সে চলে গিয়েছিল। আর কোন দিনই ফেরেনি।

২) ঘেঁটু ঃ আমাদের পাশের বাড়ী, শীতলা তলায় থাকত। তার হাঁটা চলা কথা বলার ভঙ্গি সব কিছুতেই মেয়েলী ভাব। ঘেঁটু পুজোর সময় সে মেয়েদের মত শাড়ী পড়ে মুখে নানারকম রঙ দিয়ে সাজিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে ছড়া কাটতে কাটতে যেত। সবাই নানারকম মন্তব্য করত। ওর মা অপরের বাড়ীতে ঝি এর কাজ করত। ঘেঁটু ক্রমশঃ লম্বায় বেড়ে উঠছিল। হঠাৎ একদিন শুনলাম ঘেঁটু বাড়ী থেকে চলে গেছে। আর আসেনি।

৩) পরিমল ঃ পরিমলকে আমি প্রথম দেখি আমাদের পুরনো ভাড়াবাড়ীর অন্দরে আর এক ঘর ভাড়াটিয়া বাসায়। সেই ভাড়াটিয়া ঘরের একজন ছিল রিন্টু, সে আমার ছোটবেলার বন্ধু। পরিমল কী ভাবে রিন্টুদের ঘরে আসত, সকলের সংগে গল্পগুজব করত। এমনকি ঐ বাড়ীর মালকিনের ঘরেও তার যাতায়াত ছিল। পরিমলের কথাবার্তা, চালচলন আর পাঁচটা ছেলের মত নয়। মেয়েদের সংগে কথাবার্তায় সে ছিল সহজ। রিন্টু এবং আমি ওকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম, সব সময় পিছনে

লাগতাম। পাড়ার আর সকলেও পরিমলকে চিনে ফেলেছিল। একদিন দেখলাম, পরিমল আর এখানে আসেনা। সে যেন আপনিই এসেছিল আবার চলেও গেল। কিন্তু একদম চিরতরে হারিয়ে গেল না। বেশ কয়েক বছর পর হাটখোলার রাস্তা ধরে আমি হাঁটছিলাম, সামনেই একটি নূতন রাধাকৃষ্ণের মন্দির তৈরি হয়েছে এক প্রবাসী বাঙালীর অর্থ সাহায্যে। মনে হল একবার মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহ দর্শন করে আসি। ভিতরে দেখলাম এক বাবাজী আপন মনে ঘন্টা বাজিয়ে যাচ্ছে। বিগ্রহ দর্শন করে ফিরবার পথে হঠাৎ দৃষ্টি বাবাজীর দিকে চলে এল এবং আমি আশ্চর্য এবং অবাক হয়ে দেখলাম পরিমলই হল বাবাজী। আমি এগিয়ে গিয়ে ওঁকে প্রশ্ন করলাম চিনতে পারছ? ও অনায়াসেই বলল, হ্যাঁগো হ্যাঁ, তুমি ত গোঁসাই বাড়ীর দোকানদারের ছেলে। বাইরের দিকে বেরিয়ে ওঁর সংগে গল্প করতে লাগলাম। কথা চলার মধ্যেই বুঝতে পারলাম ওর বেদনা, দুঃখ, যন্ত্রণা। পরিমলের কথা শুনে বুঝলাম, এই প্রভুজীর মন্দির দেখা শোনার দায়িত্ব তার। আমি বললাম, এখানে কতদিন থাকবে? ও বলল, যতদিন রাধামাধবের ইচ্ছা ততদিন। তার পরে অন্য মাধবের মন্দিরে। এই ভাবেই জীবন কাটিয়ে দেব বুঝলে দোকানদারের ছেলে। কী বুঝলাম? বুঝলাম পুরুষদেহ ভর করে নারী মনের এক পরিমলকে।

৪) সোমনাথ ব্যানার্জী ঃ ওঁকে আমি প্রথম দেখি নৈহাটি স্টেশনে, হালিশহরে মামাবাড়ী যাওয়ার পথে। আমার স্ত্রী দেখাল ওকে। দেখেই চমকে উঠলাম! একী, সুন্দর ফরসা লম্বা পুরুষের একি পোষাক! লম্বা চুল, গলায় একটি স্কার্ফ জড়ানো। ও তখন বোধ হয় কাঁচড়াপাড়া কলেজে পড়াত। একজন বন্ধু বলে উঠল, কী সোমনাথ দা, এবার থেকে কী সোমনাথদি বলব? উত্তর ছিল, বলনা যা খুশি। সোমনাথ ছিল উচ্চশিক্ষিত, কথাবার্তায় অকপট, কোন ভনিতা ছিল না। ওর মন যা চেয়েছে তা ও শত প্রতিকূলতার মধ্যেও করে গেছে। অর্থের অভাব না থাকায় পাকা চাকরি করার দৌলতে ওর পক্ষে অনেক লড়াই করা সহজ হয়েছে। সোমনাথ ছিল রূপান্তরকামী এবং পরবর্তীতে ও নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন সে মানবী ব্যানার্জী এবং কৃষ্ণনগরের মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ।

৫) ঋতুপর্ণ ঘোষ ঃ একজন বুদ্ধিদীপ্ত, মেধাবী, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চলচ্চিত্রকার হিসেবে আমরা তাঁকে প্রায় সকলেই চিনি। ওঁকে আমি প্রথম দেখি টিভির পর্দায়, কোন এক অনুষ্ঠানে। সম্পূর্ণ পুরুষোচিত উজ্জ্বল ব্যক্তি, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গোঁফ কথাবার্তায় যুক্তিবোধ, কিন্তু গলার স্বরটি শুনেই একটু হকচকিয়ে গেলাম। সম্পূর্ণ মেয়েলি কণ্ঠস্বর, সবার মনেই বোধ হয় একটু খটকা লাগল। অনেক ছবি করার সংগে সংগেই তার রূপচর্চার ব্যাপক পরিবর্তন হতে লাগল। গোঁফ ছেঁটে ফেলে, সুন্দর চুল একদম ছেঁটে ফেলে গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে, চোখে কাজল লাগিয়ে নিজের আসল পরিচয় নিঃসংকোচে জানান দিতে লাগল। মনে মনে বাধহয় নিজের সংগে অনেক যুদ্ধ করে তার অভিপ্রায় কী তা জানাতে লাগল। সে ছিল একজন পরিবর্তনকামী নারী। পুরুষ-এর খোলস ছেড়ে সে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। সারা জীবন নিজেকে নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে অকালেই সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। নিজের জীবন দিয়ে সে বোধহয় একটা বার্তা দিতে চেয়েছিল। এই সমাজে তার মত আরো অনেক মানব আছে। তারা বোধহয় ওঁকে দেখে তাদের মনকে আরো শক্ত করতে উদ্যোগী হবে, নিজেদের বিকশিত করার জন্য উদ্গ্রীব হবে।

৬) নাম না জানা এক নির্মাণ কর্মী। আমাদের বাড়ীর পাশেই একটি নূতন বাড়ী তৈরি হচ্ছিল। বাড়ী তৈরি করতে গেলে পুরুষ-নারী কর্মীর প্রযোজন হয়- একথা আমরা জানি। আমি দেখি দিনকে দিন বাড়ীর কলেবর বাড়ছে। হঠাৎ একদিন এক নির্মাণ কর্মীর দিকে চোখ পড়তেই একটু অবাক হয়ে গেলাম। পোশাকে সে পুরুষ নির্মাণ কর্মী হলে কি হবে, তার হাঁটা চলা, দেহের গঠন সম্পূর্ণ বিপরীত। এই পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও, তার চোখ মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যেত নীরব যন্ত্রণা, দুঃখের আবেগমথিত মুখমন্ডল। সেতো এই জীবন চায়নি। প্রকৃতিই তাকে এমন মানব রূপে পৃথিবীতে এনেছে। তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে কি কেউ ভাববে বা মর্যাদা দেবে?

আকাশ ভরা সূর্য-তারা যে নিয়মে অনড়। বিশ্ব ভরা প্রাণের ক্ষেত্রে সে নিয়মের অত কড়াকড়ি নেই। প্রাণের

ধর্ম তো তাই। মহাকাশে বিভিন্ন বল ও গতিবেগের এদিক-ওদিক হলে অনর্থ হবে। সুক্ষ্ম অণু-পরমাণুর মধ্যেও নিয়মের কড়াকড়ি। সেখানে বেনিয়মেরও একটা নিয়ম আছে। কিন্তু প্রাণীজগতের নিয়মটা বড়ই রসায়ন নির্ভর। শরীরের নানারকম গ্রন্থি থেকে নির্গত হয় রাসায়নিক পদার্থ সমূহ। আবার গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক, আবার মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব আছে মনের, মুডের, পরিবেশের ইত্যাদি। সব প্রাণীর মন নেই, চৈতন্য নেই। চৈতনাহীন কীটপতঙ্গর জীবন সম্পূর্ণ রসায়ন নির্ভর। একঘেয়ে, একইরকম। মৌমাছি, উঁইপোকা, পিঁপড়ে সবার এটাকেই অনেকে বলেন ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলা। চৈতন্য সম্পন্ন প্রাণীদের রসায়ন বড়ই গোলমেলে, ভজঘট ব্যাপার। মানব বা মানুষই হল চৈতন্য সম্পন্ন প্রাণীদের শ্রেষ্ঠতম। তাই তো বিজ্ঞান আজো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, মানবের এই ভিন্ন রূপ, তার আচার আচরণের প্রকাশের কারণ কী? অনেক বৈজ্ঞানিক জিনেটিক কারণও দেখায়। বলা হয় ক্রোমোজোমের গন্ডগোল এর জন্য দায়ী। এখন সিদ্ধান্তে আসা গেছে, ঐ তত্ত্ব ঠিক নয়। একটা মানুষের কোষের ক্রোমোজোম সজ্জাই হল দেহ গঠনের ও মনের দোলাচলের অনতম কারণ। একজন স্বাভাবিক পুরুষ মানুষের 46xy হল সঠিক এবং একজন স্বাভাবিক নারীর তা হল 46xx। এর বাইরে সে কোন ক্রোমোজোমের সজ্জার কারণগুলিই হল আলোচিত চিরাচরিত মানবরূপের বাইরে অন্যান্য মানব কূলের সৃষ্টি।

পিংক রং এর গোলাপফুল আমাদের সকলারেই খুব প্রিয়। কিন্তু গোলাপ কী শুধু পিংক রং এরই হয়। হলুদ বা সাদা রং এর গোলাপও তো আমরা দেখি, ভালবাসি এবং ফুলসজ্জাতেও স্থান দিই। তবে কেন শুধুমাত্র পুরুষ বা নারী? অন্যান্য মানবদের আমরা কেন সমান চোখে দেখবো না? ঘৃণা নয়, অবমাননা নয়, নিপীড়ন নয়, শুধুমাত্র ভালবাসা, মমতা ও সহযোগীর মত হাত বাড়িয়ে তাঁদের আপন করে নিতে পারলেই সারা বিশ্বই মানবময় হয়ে উঠেতে পারে।

পৃথিবী, আকাশ এবং সর্বপ্রথম মানুষ আদম ইত্যাদির সৃষ্টির মালিক আল্লাহ।

ড. বাবুল আলম
অতিথি অধ্যাপক

সুরাহ বাকরা ঃ আয়াত - ৩০

যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিস্তাদের বললেন, আমি পৃথীবিতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি; তারা বলল, অপনি কি সেখানে এমন মাঘলুককে সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই আপনার সপ্রশংসে মহিমা কীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। আল্লাহ পাক বল্লেন, আমি যা জানি, তোমরা তা' জাননা।

সুরাহ ইউনুস - ১০ ঃ আয়াত - ৩, ৪

(৩) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করে থাকেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশকারী কেউ নেই। স্রষ্টা ও পরিচালক আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা তার ইবাদত কর। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবেনা? (৪) তোমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের দিকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ পাকের ওয়াদা সত্য। নিশ্চয় তিনি প্রথম বার সৃষ্টি করেন, তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন, যাতে তাদেরকে ইনসাফ মতো প্রতিফল প্রদান করেন। যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আর যারা কুফরী করেছে, তারা তাদের আচরিত কুফরীর ফলে পান করার জন্যে পাবে উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

সুরাহ হুদ - ১১ ঃ আয়াত - ৭

তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সময় তার আরশ পানির উপরে ছিল, যাতে তোমাদের কে পরীক্ষা করে নেন তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম কে। আর যদি তোমরা বল, নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে, তা' হলে যারা অবিশ্বাসী তারা অবশ্যই বলবে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু।

সুরাহ হিজর - ১৫ ঃ আয়াত-২৬, ২৭, ২৮, ২৯

(২৬) নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কালো, পচা, শুষ্ক, ঠনঠনে মাটি হ'তে। (২৭) আর এর পূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি ধূম্রহীন বিশুদ্ধ অগ্নি হ'তে। (২৮) ইয়াদ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিস্তাদেরকে বললেন, আমি কালো, পচা, শুষ্ক, ঠনঠনে মাটি হ'তে মানুষ সৃষ্টি করব, (২৯) যখন আমি তাকে সুঠাম করব, এবং তাতে আমার রুহ ডালব, তখন তোমারা সকলে তাকে সিজদা করবে।

সুরাহ নুর - ২৪ ঃ আয়াত - ৪৫

আল্লাহ পাক সমস্ত জীবনকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। কিছু জীব পেটের ভরে চলে, কিছু দু'পায়ে চলে এবং কতক চার পায়ে চলে। আল্লাহ পাকের যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান — (এখানে এই কথার সংকেত দেওয়া হয়েছে যে, কিছু জীব এমন আছে যারা চারের অধিক পা বিশিষ্ট, যেমন কাঁকড়া মাকড়সা ও অন্যান্য পোকা মাকড়)।

সুরাহ হা-মীম সাজাদাহ - ৪ ঃ আয়াত - ৯,১০, ১১, ১২।

(৯) বল তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবে, যিনি দু দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তার সমকক্ষ দাঁড় করাবে? তিনি তো বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। (১০) তিনি পৃথিবীর উপরে। পৃথিবী থেকে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং স্থাপন করেছেন কল্যাণ এবং চার দিনের মধ্যে তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, সমান ভাবে

সকল অনুসন্ধানীদের জন্য। (১১) অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ অতঃপর তিনি আকাশকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এস। ওরা বলল, আমরা তো অনুগত হয়ে আসলাম। (১২) অতঃপর তিনি আকাশ মন্ডলীকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন। আর আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম; প্রদীপমালা দ্বারা; এবং তাকে করলাম সুরক্ষিত। এ সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।

কুরআন শরীফের একাধিক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এখানে তার কিছু বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলেছেন, পৃথিবীকে দু'দিনে বানিয়েছেন, আর এ থেকে রবি ও সোমবার বুঝানো হয়েছে। (তবে সে দিনের পরিমাণ কত তা আল্লাহ পাক ভাল জানেন)। সুরা নাফিআত - ৩০ আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা থেকে বুঝা যায় যে, পৃথিবীকে আসমানের পর বানানো হয়েছে। অথচ, এখানে পৃথিবী সৃষ্টির উল্লেখ আকাশ সৃষ্টির পূর্বে করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লা আলাইছে আসল্লামের চাচার ছেলে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজিআল্লহ এর ব্যাখ্যা এই ভাবে করেছেন যে, সৃষ্টি করা এক জিনিস আর বিস্তৃত করা বা বিছানো আর এক জিনিস। অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি আশমানের পূর্বে হয়েছে। পৃথিবীকে বসবাসের যোগ্য বানানোর জন্য এর মধ্যে পানির ভান্ডার রাখা হয়, তাকে প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের ক্ষেত্রে বানানো হয়। এতে পাহাড়, নদনদী এবং নানা প্রকার ধাতু ও খনিজ পদার্থ রাখা হয়। এসব কাজ সুসম্পন্ন হয় আকাশ সৃষ্টির পর। অন্য দুই দিনে। এইভাবে পৃথিবী ও তার সংশ্লিষ্ট সমস্ত জিনিসের সৃষ্টি চার দিনে পরিপূর্ণ হয়।

সুরা নাযিআত - ৭৯ ঃ আয়াত - ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

(২৭) তোমাদের কে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ? যা তিনি নির্মাণ করেছেন, (২৮) তিনি তার ছাদ কে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (২৯) এবং তিনি এর রজনীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং দিনকে সুর্যালোক প্রকাশ করেছেন। (৩০) তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। (৩১) তিনি তা থেকে বহির্গত করেছেন তার পানি ও চারণভূমি। (৩২) আর পর্বত সমুহ কে তিনি দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করেছেন।

পূর্বে হা মীম সিজদার আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, সৃষ্টি করা এক জিনিস, আর বিস্তৃত ও বাসোপযোগী করা অন্য এক জিনিস। পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আকাশের পূর্বে, কিন্তু তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে আকাশ সৃষ্টির পরে। এখানে সেই তত্ত্বই বর্ণিত হয়েছে। সমতল ও বিস্তৃত করার মানে হ'ল পৃথিবীকে সৃষ্টি ও বাসোপযোগী করার জন্য যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন, আল্লাহ পাক তারপ্রতি গুরুত্ব দিলেন। যেমন জমিন থেকে পানি নির্গত করলেন, অতঃপর তা হতে নানা খাদ্য সামগ্রী উৎপন্ন করলেন, পাহাড় সমুহকে পেরেক স্বরূপ মজবুত ভাবে জমীনে গেড়ে দিলেন, যাতে জমীনটা না হিলে।

Global Warming and its Environmental Impact

Kritiman Biswas

Assistant Professor, HOD, Environmental Studies

The term "greehouse effect" ordinary usage simply means that average global air temperatures will increase by several degrees as a result of buildup of carbon dioxide and other "greenhouse" gases (such as methane, chlorofluorocarbons, nitrous oxide and water vapour) in the atmosphere. Indeed, many scientists beiieve that such global warming has been under way already for some time, and ts largely responsihle for the temperature increase of about two-thirds of a degree Celsius that has occurred since 1860.

There may be both positive and negative effects associated with any significant increase in the average global temperature. Indeed, the phenomenon of rapid global warming - with its demand for large scale adjustments - is generally considered to be our most crucial world-wide environmental problem. Unlike stratospheric ozone depletion, which has manifested itself in spectacular fashion in the form of the ozone hole, the phenomenon of global wanning due to the greenhouse effect has yet to be observed in a fashion that conveniences everyone of its existence. No one currently is sure of the extent or timing of future temperature increases, nor is it likely that reliabie predictions for individual regions will ever be available much in advance of the events in question. If current models of the atmosphere are correct, however, significant global warming will occur in coming decades. Thus it is important that we understand the factors that are driving this increase in global temperatures so that we can take steps now to avoid rapid change in the future.

Energy from the sun drives the earth's weather and climate, and heats the earth's surface; in turn, the earth radiates energy back into space. Atmospheric greenhouse gases (water vapour, carbon dioxide and other gases) trap some of the outgoing energy, retaining heat somewhat like the glass panels of a greenhouse. Without this natural "greenhouse effect", temperatures would be much lower than they are now, and life as known today would not be possible. Instead, thanks to greenhouse gases, the earth's average temperature is a more hospitahle 60°F. However, problems may arise when the atmospheric concentration of greenhouse gases increases.

Since the beginning of the industrial revolution, atmospheric concentrations of carbon dioxide have increased nearly 30%, methane concentrations have more than doubied and nitrous oxide concentrations have risen by about 15%. These increases have enhanced the heat-trapping capability of the earth's atmosphere. Sulfate aerosols, a common air pollutant, cool the atmosphere by reflecting light back into space; however, sulfates are short-lived in the atmosphere and varied regionally.

Greenhouse gas concentrations are increasing :

Scientists generally believe that the combustion of coai, oil, gases and other human activities are the primary reason for the increased concentration of carbon dioxide and other greenhouse gases. Plant respiration

and the decomposition of organic matter release more than 10 times the $C0_2$released by human activities; but these releases have generally been in balance during the centuries leading up to the industrial revolution with carbon dioxide absorbed by terrestrial vegetation and the oceans.

This CO_2 plays an important role in changing the global climate. Without CO_2 the earth would be as cold as moon. By trapping the heat radiating from the earth's surface, CO_2 regulates global temperature to life-sustaining 15°C.

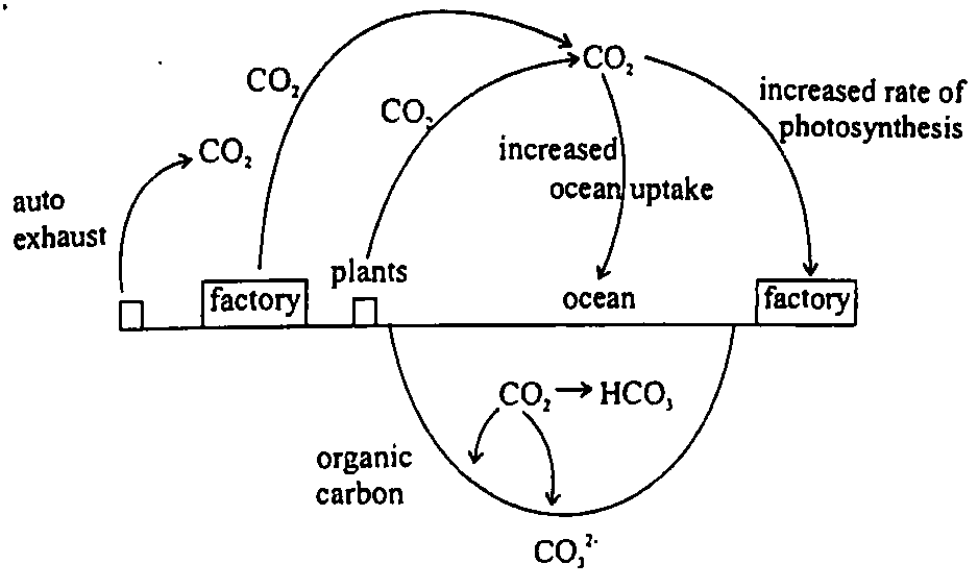

Sonrces and sinks of CO_2

What has changed in the last few hundred years is the additional release of carbon dioxide by human activities. Fossil fuels burned to run cars and trucks, heat homes and businesses, and power factories are responsible for about 98% of U.S carbon dioxide emissions, 24% of methane emissions, and 18% of nitrous oxide emissions. Increased agriculture, deforestation, landfills, industrial production, and mining also contribute a significant share of emissions. Estimating future emissions is difficult, because it depends on demographic, economic, technological, policy and institutional developments. Several emissions scenarios have been developed based on differing projections of these underlying factors. For example, by 2100, in the absence of emissions control policies, carbon dioxide concentrations are projected to be 30-150% higher than today's levels.

Other greenhouse gases: Carbon dioxide is not the only culprit contributing to the greenhouse effect and globalarming. It is the major greenhouse gas but other greenhouse gases are methane, chlorofluorocarbons, nitrous oxide and water vapour.

Grccnhose gas	Concentration (ppm)	Increase % per year
CO_2	356	0.4
CH_4	1.7	1.0
N_2O	0.3	0.3
CFC	0.0005	5

Greenhouse gas

The abovementioned table shows that the concentration of these active greenhouse gases is increasing signiflcantly each year.

Changing Climate:

Global mean surface temperatures have increased 0.5-1.0 °F since the late 19th century. The 20th century is 10 warmest years all occurred in the last 15 years of the century. Of these, 1998 was the warmest year on record. The snow cover in the Northern Hemisphere and floating ice in the Arctic Ocean have decreased. Globally, sea level has risen 4-8 inches over the past century. Worldwide precipitation over land has increased by about one percent. The frequency of extreme rainfall events has increased throughout much of the United States.

Increasing concentrations of greenhouse gases are likely to accelerate the rate of climate change. Scientists expect that the average global surface temperature could rise 1-4.5 °F (0.6-2.5 °C) in the next fifty years, and 2.2-10 °F (1.4-5.8 °C) in the next century, with significant regional variation. Evaporation will increase as the climate warms, which will increase average global precipitation. Soil moisture is likely to decline in many regions, and intense rainstorms are likely to become more frequent. Sea level is likely to rise two feet along most of the U.S coast. Calculations of climate change for specific areas are much less reliable than global ones, and it is unclear whether regional climate will become more variable.

Impacts of the climate change:

If the climate were to change according to model predictions, one would expect to see fewer severe storms, in view of the reduced temperature gradient between the tropics and high latitudes. Model calculations do not indicate an increase of hurricanes, El Nino events, or other kinds of climate oscillations. The empirical evidence displayed in the IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change] report shows a decline in hurricanes over the last fifty years in both frequency and intensity [IPCC, 1996]; a future warming is not expected to affect frequency or intensity appreciably [Henderson - Sellers etal, 1998], Observations on El Nino events are not conclusive as yet.

Sea-level rise :

With respect to sea-level rise, it has been assumed, conventionally, that a warming will increase the rate of rise, because of the thermal expansion of ocean water and the melting of mountain glaciers. Certainly, when viewed on a millennial scale, sea level has been rising steadily. But when examined on a decadal scale, which is more appropriate to human intervention, sea-level rise is found to slow during periods of temperature increases, for example, during the temperature rise from 1900 to 1940. Evidently, increased evaporation, linked to warming, results in increased accumulation of ice in the polar regions, thereby lowering sea level. This conclusion seems to be backed by direct observation of ice accumulation, as well as by some modeling studies. A future modest warming should therefore slow down, not accelerate the ongoing rise of sea levels.

Health effects :

The world's leading authority on global warming, the Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC] is a United Nations-sponsored organisation made up of 2,500 scientists from around the world. The IPCC projects that more frequent and more severe heat waves will be an early effect of global warming. Events such as the deadly stretch of hot days that killed 669 people in the

Midwest during the summer of 1995 and 250 in the Eastern United States in July 1 999 are likely to become more common. Scientists are already finding that the number and intensity of extreme weather events are increasing.

Infectious disease is the second major threat that global warming poses to human health. As temperatures rise, disease-carrying mosquitoes and rodents move into new areas, infecting people in their wake. Scientists at the Harvard Medical School have linked recent U.S outbreaks of dengue fever, malaria, Hantavirus and other diseases to climate change.

Global warming could mean millions more around the world will become infected with malaria. Since 1 990, the start of the hottest decade on record, outbreaks of locally transmitted malaria have occurred in California, Florida, Georgia, Michigan, New Jersey and New York. IPCC scientists project that as warmer temperatures spread north and south from the tropics, and to higher elevations, malaria-carrying mosquitoes will spread with them. They conclude that global warming will likely put as mueh as 65% of the world's population attisk of infection an increase of 20%.

In association with a warm winter and prolonged drought, New York City experienced a significant outbreak of West Nile virus in the summer of 1999. Seven persons died from mosquitoes infected with the virus. The infected larvae survived the mild winter temperatures and the city experienced another outbreak of the virus in 2000. Birds infected with West Nile virus have also been found in Maryland, Virginia and Washington, B.C.

When McAllen, Texas suffered a severe outbreak of dengue fever in 1995, the Houston Chronicle's headline read, "Warming Climate Invites Dengue Fever to Texas". Epidemiologists reported that an unusually mild winter and hotter than normal summer contributed to the spread of the disease, which is carried by mosquitoes.

Outbreaks of encephalitis, another mosquito-borne illness with strong links to warmer temperatures, also appear to be on the rise. Since 1987 there have been major outbreaks in Arizona, California, Colorado, Florida, Louisiana, Mississippi and Texas.

Measurement of Glohal Warming :

Although scientists agree on the theory of Greenhouse warming, debate continues as to whether the increase in these greenhouse gases have actually began to warm the global climate. They hope to settle the question with measurement of the speed of sound by sending pulses of underwater sound around the world through all five of its ocean basins.

The experiment is directed by Walter Munch of the Scripps Institute of Oceanography, La Jolle, California, USA and conducted by an international team of eight nations. It is based on the principle that the speed of sound in water (1.609 km sec^{1}) depends on the temperature of water, the warmer the water; the faster sound propagates through it.

In the experiment a small ship is anchored near Heard Island, a remote Australian Island in the southern Indian Ocean. An underwater loud speaker is lowered to a depth of 250 meters and for nine days the speaker broadcasts signals of low notes at high volumes. Heard Island was selected because it permits extension

of direct paths through each of world's five oceans: sound conducted along these paths should be audible to acoustic sensors placed thousands of kilometers away. Underwater microphones are installed in the Antartic, near Barmuda and San Francisco and along the coasts of South Africa, India, Australia, New Zealand and Canada. The distances between Heard Island and the various microphones are all known precisely, so that careful measurements of the time an acoustic signal takes to reach a sensor will permit calculations of the average speed of sound over the course.

If predictions of global warming are correct and the temperature of the ocean is rising as expected, sound will travel significantly faster each year over the 17,920km. distance from Heard Island to San Francisco, According to Munch, travel time for sound covering this route should be reduced by as much as 0.25 seconds each year.

Solutions of Global Warming : An Overview

The good news is that we can slow and eventually stop global warming, but we'must act today. The most important step we can take to curb global warming is to improve our nation's energy efficiency. Our cars and light trucks, home appliances and power plants could be made much more efficient by simply installing the best current technology. Energy efficiency is the cleanest, safest, most economical way to begin to curb global warming.

No global warming solution will succeed unless we can control emissions from our cars: While there is no technology to remove CO_2 from a car's exhaust, we can make them pollute less by making them more fuel-efficient. By using today's best technology, car makers could dramatically increase the fuel economy of their cars and trucks. If we are to make any progress in slowing global warming, we must make our cars go further on gas.

Clean up our electrical power plants: We also need to clean up our electrical power plants. Most electric utilities still use coal to produce electricity, spewing millions of CO_2 and other pollution into the atmosphere every year. Converting these plants to cleaner natural gas could solve part of the problem.

References :

1. Environmental Chemistry,–A. K. De.
2. Environmental Chemistry,–Colin Baird
3. Environmental Science,–S. C. Santra
4. Elements of Environmental Science and Engineering,–P. Meenakshi
5. Introduction to Enviromental Science,–Y. anjaneyulu.
6. Essential of Ecology and Environmental Science,–S. V. S. Rana.
7. Environmental Management,–Krishnamoorty

User Edncation Programme in College Library with referenc to the Hiralal Bhakat College Library

Partha Chattopadhyay
Librarian, H. B. College

Abstract : One of the most Education Programme. Through this programme we can try to teach our users what to do and how to do in the library correctly.

Keywords : User education, Accession Numer, Call No., Cataloguing, Users.

To discuss about college library it will be good to explain the actual meaning of the word 'Library'. The word 'Library' is derived from the latin word 'Libra'. Different individuals define 'Library' in different ways. A common definition of library can be stated as collection of printed, non-printed and various graphic materials arranged systematically for the purposes of general reading, research, study or for any type of use. Usually there are mainly three types of libraries such as Academic, Public and Special. College library belongs to the first one.

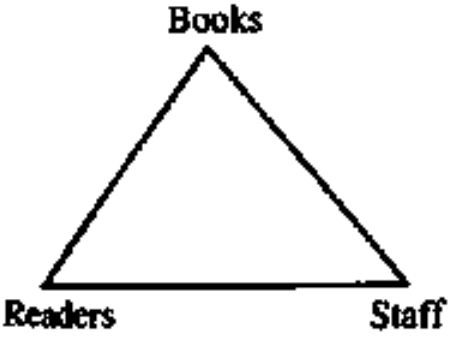

According to the scholars library is a trinity of Books, Readers / Users and Staff. Here the second component is the users' who are the most important part of this trinity. Without users the existence of library is meaningless. We now consider here about College Library. Users mean those individuals who use the resources of the library. Students, teaching & non-teaching staff belong to the users community of the College Libary. From my experience it is found that students are the regular uesers of the library. Students come to the College Library after completing the 10th + II standard school education where the concept of using the resoures (books, journals, online resurces) of library is negligible. It is the College wherefrom the students enter into the vast arena of higher education. College Library is the first step where the concept of using the library is strong rooted among the students. Based upon these, studenis will be the life-long devotee of the library.

From my experience I realise that students cannot approach with a suitable search query in front of the Circulation Counter. They are not also aware about the technical devices such as Cataloguing, Classification (Call No.), Accession No., OPAC (Online Public Access Catalogue) search, Internal Surfing and other Anticipatory and Responsive Services of the library.

From the very first day of the library we need to motive and educate our users to the right direction for maximum utilization of the both printed and non-printed ducuments of the library.

Through this paper I want to convey a message towards our users about the various technicalities of the library. Mainly three important aspects are to be discussed here.

First one is the Accession Number. Accession Number is such a number by which each and every library book is recorded. This is an unqiue number and is appeared on the reverse side of the first page of the book.

Another techinal term is Call No. which is reflected on the spine label of each and every book of the library. Let us discuss this concept by giving an example of a book say 'MALINI' written by Rabindranath Tagore. Its call No. will be

Call No. { 891.442 ► Class No.
T326 ► Author Mark
C10 ► Copy No. }

Such number is appeared on the spine label of the 10th copy book of 'Malini'. The total holding of the library is arranged systematically on the shelves with the help of this Call No. Each and every document of library carries a Seperate Call No. In a single word we can say that this no. is an identification no. of the book.

Users should differentiate between the Accession No. and Call No. to become a potential user in future.

Now I switch over to the Cataloguing Concept. Obviously Cataloguing reveals the total holdings of he library by subject, author, title etc. With the help of Cataloguing a complete picture of the library is brought out to the users. But users have to know how to search the catalogue, and to get their desired documents from the library. Here users face some problems. Due to the lack of their expertise to handle such technical devices generally they got annoyed and ultimately become disheartened. Here needs proper User Education by which we, the library staff guide our users properly. Users satisfaction is our ultimate goal because without satisfied users existence of library is meaningless.

In his technology-driven society we have to think seriously that it is need of the hour that to automate all the house-keeping operations of the library such as Acquisition, Cataloguing, Circulation, Serial Control and other management related aspects of the library to save the time of our users.

A common notion among us that use of computer is very difficult task to perform. But we have to think and rethink that computer is nothing but a tool to modernise our services. Not only modernisation but the other factors such as transparency, ease of access and manual work load etc. should take into consideration.

Users are advised not a get any panic while retrieving any information from the computer terminal.

Now we install in our library a new Internationally accepted software namely 'KOHA' to automate our lirary services. My idea is that an User Education Programme will be conducted with the new comers and existing students to highlight different aspects of using software oriented and other technical aspects of the library.

Our young generations are very much eager to welcome the new technology related services. I think there should not be any technophobia to access all the relevant and pertinent information regarding library.

Helping attitude, Congenial environment of the library can make our users to become satisfied.

Through UEP we shall discuss Various Frequently Asked Questions (FAQs) of our users and try to answer their questions very easily so that users can understand that very easily. Our motto is to hundred percentage satisfaction of users.

HUMAN VALUES IN ENVIRONMENTAL ETHICS : A STUDY

Debabrata Saha
Asstt. Professor in Philosopy & T.I.C. of the College

: INTRODUCTION :

The term Value' as different meanings it may mean aim, necessity, nature etc. main usually protects which is valuable to him. Here valuable means which meets or needs. But we are not aware of the crisis which we may face to meet our needs. For this reason we sometimes exploit our environment to fulfill our apparent needs. Such actions may lead to us destruction of lives human or other living beings. So a study of human values and the necessity of protecting environment is necessary for present world,

Environmental ethics helps to fulfill man's moral and ethical obligations toward the environment. But Human values become a factor when looking at environmental ethics. Humans assigned valne to certain things and then use this assigned value to make decisions about whether something is right or wrong. Human values are unique to each individual because not everyone places the same importance on each element of life. For example, a person living in poverty in an undeveloped Country may find it morally acceptable to cut down the forest to make room for a farm where he can grow food for his family. However, a person in a developed Country may find this aetion morally unacceptable because the destruction of forests increases carbon dioxide emissions in to atmosphere, which can negatively impact the environment.

Environmental ethics believe that humans are a part of Society as well as other living creatures, which includes plants and animals. These items are a very important part of the world and are considered to be a functional part of human life. Thus, it is essential that every human being respect and honor this and use morals and ethics when dealing with these creatures.

Environmental ethics is a key feature of environmental studies that establishes relationship between human beings and the earth. With environmental ethics, we can ensure that we are doing our part to keep the environment safe and protected. Every time that a tree is cut down to make a home or other resources are used we are using natural resources that are becoming more scare to find. It is essential that we do our part to keep the environmental protected and free from danger. It is not as difficult to do as we may think so long as we are willing to make a few simple and easy changes.

Trafficking of Women: A Process of Social Marginalization

Suddhasattwa Banerjee
Asstt. Professor in English

"The UN Special Report On the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography" (2008) defines Child Prostitution as the sexual exploitation of a child for remuneration in cash or in kind. Thus the violence against girl children acquires a new dimension in the sale of young girls below the age of 18 for prostitution and trafficking. To curb this, the "Suppression of Immoral Trafficking Act" (1966), gets modified in 1979 to the "Prevention of Immoral Trafficking Act".

Prostitution in India is a Rs forty thousand billion annual business. It has been estimated that 30% of the sex workers are children, who earn Rs eleven thousand billion. This has been reported by a study by the Centre of Concern for Child Labour (CCL). (The Times of India, 10 Nov 2008). At present the number of child prostitutes in India is between 2.7million and 4million with the number of children in "commercial prostitution" increasing at the rate of 8-10% per annum. The practice of child prostitution is in blatant contravention of the UN Declaration on the Rights of the Child(1984), endorsed by the "National Policy for Children" (1988) of the Ministry of Social Welfare, Government of India. Principle 9 of the Declaration states: The child shall be protected against all forms of neglect, cruelty and exploitation. They shall not be subject to traffic in any form."

Poverty and deprivation, coupled with a low status in society for girls is a primary factor for child trafficking. According to a UNICEF Report, 2005, prostitution exists in the Third World because of poverty and children are often required to work to supplement the meager incomes of their families. (Hindustan Times, 28 Oct 2006). Thus in a country like India, child trafficking and prostitution in most cases stems from child labour. Prostitution is often viewed as an avenue providing easy money, which seems attractive for families steeped in poverty.

Dr. K. K. Mukhopadhyay from Delhi School of Social Work, University of Delhi, in his presentation, dt. 02-11-2004, based on surveys he conducted for the Government of India, said that young girls in India were taken away from their parents in poor backward and drought affected districts of the country for purposes of trafficking. These were also states with gender inequality and low literacy rates. The trafficking network was well organised in these areas. He found in his survey that about 80% of the prostitutes in India came to this profession as children and due to difficult circumstances, such as poverty, illiteracy, ignorance, and deception. The increasingly consumerist society only further complicated the situation. Children are often hired out or sold by their families to agents who may or may not reveal the true nature of the work offered. The agent may promise a job as a domestic servant or factory worker at a wage many times higher than is customary in rural areas. A sum which is large in the

eyes of the family may be handed over to them, and the child is obligated to work to pay off the debt. Some young girls are deceived by young urban boys who go to villages. The boys conduct fake marriages with these girls, bring them to the cities and sell them to the brothels.

On the economic front, it must be noted that development policies and patterns of development promoting tourism, industrialization, rural to urban migration particularly of males generate a demand for commercial sex. In such a situation, the developing countries bear the brunt of the problem. Economic disparities within countries and between countries and regions fuel the demand for trafficking from low income to high income areas. In addition, population mobility has been facilitated by globalization and liberalization as they have opened borders and relaxed controls. Such a scenario gives a spurt to tourism which leads to 'sex tourists' from the West journeying East with the purpose of exploiting children. Goa has become one such haven for pedophiles and people indulging in child prostitution. According to unofficial estimates, there are at least 4,000 minors in the locality involved in the trade.

Further, there is no respite in the situation as the existence of minors is often hidden on receiving a tip off about the raids. There are also instances of the arrest of 25 odd girls and their being summarily released subsequently, once their ages have been found to be above 18. The exploitation is shown in the fact that a girl below the age of 16 is available for Rs 3000 - Rs 5000, justifying for Goa the name of 'India's Bangkok' (Times of India, 23-09-2009). Men who travel to the Third World for sex with children', argue that there is nothing new in going abroad to escape the moral structures at home. This phenomenon is further enhanced by the growing demand for very young girls with a premium on virgins. According to Ms. J. Prasanna, a research scholar of the Department of Criminology, Madras University, the fear of AIDS often makes the Western 'sex tourist' to seek virgins. Such a demand is catered to by large markets in Bombay and Hyderabad also (The Hindustan Times, 5 Oct 2004).

Child prostitution in India is further aggravated by the presence of social conventions and myths prevailing in society. It is popularly believed that sex with a virgin is a cure for venereal and other diseases. Moreover, a reason for the rise in child trafficking can be attributed to the myth that having sexual intercourse with a child would protect the client from AIDS. This was stated at a workshop organized by UNICEF on "The Rights of the Child" in 1997. With the low levels of education and literacy, such myths are only perpetuated. It is well known that the female sex is further disadvantaged due to the inadequate educational and employment opportunities, gender disparities in access to opportunities and the lack of social safety net.

Social conventions play an important role in the continuance of the phenomenon of child prostitution. These include child marriages, polygamy, dowry and social stigma against single, unwed or divorced women and girls who have been sexually abused. Children, especially young girls, in these circumstances are especially vulnerable to the prostitution racket. There have been instances of girls being driven into the sex trade following traumatic sexual experiences during childhood, including rape. In the case of Shahida of

Kozhikode , it was the violence inflicted by her father's younger brother followed by molestation by her cousin and then rape (The Hindustan Times, 2 Oct 1998). The tale of woe of Lakshmi of Bhopal began when she was raped by her step father at age 8 and her further sexual exploitation for food when she left home (Times oflndia, 12-06-2002). Prostitution thus becomes a viable option for children who have been abandoned, for those from disrupted families and for those who are financially supporting their families.

The prevalence of traditional and religious practices in some communities that consist of dedicating girls to gods and goddesses serve to encourage child prostitution (The Hindu, 21-03-1998). The evolution of the Devadasi cult can be traced to a period earlier than the entry of Aryans in India. The cult appears to be a relic of the Dravidian matriarchal society. It exists today in India with many regional variations (Annual Report, Rights for Women and Children, Human Rights Commission, India, 1980). This social convention condemns nearly 5 to 10 thousand girls every year to a life of sexual servitude (concubinage) and subsequently into prostitution. The Devadasi girls form 15% of the total women in prostitution in India. In the border districts of Maharashtra and Karnataka, their percentage in prostitution is nearly 80%. The striking fact is that all of them have entered prostitution in an extremely organized manner. This proces involves first making the girl a Devadasi and then legitimizing her entry into prostitution with the help of religion'. The practice receives sanction from mythology and was once supported by feudal land owning systems. Social backwardness is the most closely linked factors to both Devadasis and prostitutes. It is known that ethnic minority, "scheduled castes" and "other backward classes", indigenous people, hill tribes, refugees and illegal immigrants are particularly susceptible to the racket. Interestingly, the "signs" used to identify the chosen child (who is then dedicated to the goddess Yellamma) are those of ill health - white patches of eczema, leprosy and even mental retardation. Researchers now speculate whether prostitution was one lucrative way of making use of such otherwise "worthless children".

Among those involved in child prostitution, it is the street children who are most vulnerable to it. According to Dr. A. B. Bose, advisor of the Planning Commission, Govt. of India during 1994 - 1999, the problem of street children is primarily the outcome of four circumstances -poverty, non-existence of a supportive social and economic structure, rapid urbanization leading to chronic housing shortage and the growth of slums and an oppressive home environment (Times of India, 09-07- 1999).

The prevailing situation is aggravated by the lack of awareness of legal rights, the exploited situation of the victims and the absence of a channel for seeking redress. In the presence of the growth of trans-national crime and expansion of drug trafficking networks, weak law enforcement mechanisms, exploitation by corrupt law enforcers and officials are the order of the day. On paper, prostitution per se is not illegal and hence there are loopholes in the law that ensure a person goes scot-free even if he sells a girl to a brothel, provided there is a fake agreement.

The erosion of traditional family systems and values and the pursuit of consumerism encourages sale of women. The National

Commission for Women identifies sexual glorification by the electronic media as one of the prime reasons for minors in prostitution (Annual Report, 2007). In 2011, the Central Social Welfare Board conducted a study on the link between trafficking and Prostitution. Among the causes of entry to prostitution., economic distress accounted for 41%; desertion by spouse = 24.5 %; deception = 11.9%; social customs = 5.35%; family tradition = 5%; kidnapping and abduction = 2.25%. The study also indicates that many of the young girls join, emulating the example of girls who have joined the trade and as a consequence are living well.

It has also been shown that most prostitutes are forced to remain in their professions due to police highhandedness and the clout of local henchmen. This makes chances of rescue and rehabilitation very slight. It has been found in 2004 that India has 4 million child prostitutes. According to Mr. K..T. Suresh of the Bangalore based NGO "Equations", about 20% of India's 2 million prostitutes are below the age of 15. Bombay city alone is believed to have 2, 00,000 child prostitutes. The flesh trade in India is liberally replenished from Nepal, which is believed to contribute an estimated 80,000 young girls every year (The Hindustan Times, 5 Oct 2004). The survey conducted by the Central Social Welfare Board in 2010-11 in the cities of Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Hyderabad and Bangalore shows that 15% are below the age of 15 at the time of entry and 25% are minors in the age group of 16-18 years.

However, among the various studies conducted, there does appear to be some discrepancy in their findings. A study on prostitution in Delhi University has challenged the findings of the Annual Report (2011) by the National Commission for Women on Child Prostitution. While the NCW says that children form 60% of the prostitutes in the Capital's main sex market at G.B. Road, the study by Jan Shakti Vahini figures it as low as 7% (Indian Express, 20-06-2012).

On a similar note, very few cases of child sex workers have been reported in the state of Kerala. However, according to the study conducted by the School of Social Sciences, Loyola College, Chennai on "Girl Children in Prostitution" (2008), this does not imply their total absence; it merely indicates that locating them is difficult. Violence against prostitutes is of two kinds and relates to violence at the workplace. Girls are sold by their parents or procured by abductors. A good number, about 25% to 30% are known as chukris in Calcutta. These women who are sold by their parents or husbands are severely beaten and tortured into submission. As a rule they have to pass on all their earnings to the keepers and any deviation from this norm is also countered with violence. Lack of space accounts for the presence of keepers in a big way. However those with a place of their own face yet another problem: Goondas forcefully seek entry into the women's houses and assume the role of the pimps. They live off their earnings and, in case of resistance, get violent. Even the clients also use violence to make these children submissive. The annual report of Durbar Mahila Samiti, of 2011 showed that 65% of women in the prostitution industries of India are from West Bengal, of whom a third are from Murshidabad, Birbhum and Burdwan or the Radh area. The Radh has traditionally sent girls to Calcutta for prostitution. What is important here is the prevalence of child marriage and child widows.

When they returned to their parent's home, as they were considered burdens, they were sent off to Calcutta to work as housemaids or prostitutes. Earlier, these women came from Kulin Brahmin and Kayastha families, nowadays they are from all castes.

Micro studies conducted by Prerana, Mumbai, conducted 10 focus group interviews of five children in each group reveals that the age of becoming a prostitute was under 18 for 90.3 % of the girls, the average age being 16 years (Prerana, 2005). When dealing with child prostitution, the best possible available indicator as to its prevalence is the incidence of AIDS and sexually transmitted diseases in the age group below 18. One in every two women in Mumbai's brothels is infected by HIV and one in every three attends STD clinics. Nationally, it estimates that the incidence of HIV was 25% among women in prostitution and 10% among clients. Sudden increases in the number of kidnappings and abduction of young girls and their subsequent adoptions could possibly be indicators of the practice of child prostitution. The National Crime Records Bureau reported a 100% increase in kidnappings in the last two years. Often, young girls are kidnapped from their homes. 60% of these children are forcibly "married", and then hidden by the brothel owner until they reach the "profitable" ages of 9-13 years.

জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানাতে এন.সি.সি-র কুচকাওয়াজ।

মেধা অন্বেষণ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, সাংসদ বিধায়ক ও অনুষ্ঠানে সভাপতি করুক প্রদীপ প্রজ্বলন।